রাহুল সাংকৃত্যায়ন

ভোলগা
গঙ্গা

চেতনার দাসত্ব

ও অন্যান্য প্রবন্ধ

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

চিন্তা প্রকাশনী
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

CHETANAR DASATWA O ANYANYA PRABANDHA

Bengali translation of Rahula Sankrityayan's Hindi Original
Dimagi Gulami & Four Essays from Rahula Nibandhabali

© Dr. (Mrs.) Kamala Sankrityayan

অনুবাদ

কমলেশ সেন
রবীন্দ্র গুপ্ত
মলয় চট্টোপাধ্যায়

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট, ১৯৯৩ ॥ শ্রাবণ, ১৪০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ

জুলাই, ২০০০ ॥ শ্রাবণ, ১৪০৭

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর

এম. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১৫ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ

সন্দীপন ভট্টাচার্য

ISBN 81-85696-09-8

দাম : ৩০·০০
(Rs. 30.00)

গ্রন্থস্বত্বাধিকারিণীর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী মূল হিন্দী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের
সর্বস্বত্ব চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক সংরক্ষিত

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ... ৫

চেতনার দাসত্ব

চেতনার দাসত্ব ... ১১
গান্ধীবাদ ... ১৭
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ... ২৫
শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ... ৩১
নব-নির্মাণ ... ৩৮
জমিদারী প্রথা চাই না ... ৪৫
কৃষকেরা, হুঁশিয়ার ! ... ৫০
হরিজনদের কি প্রয়োজন ? ... ৫৪
খেতমজুর ... ৫৮
রাশিয়াতে আড়াই মাস ... ৬১

অন্যান্য প্রবন্ধ

আমি কি করে গল্প লেখক হলাম ... ৬৭
প্রেমচন্দ স্মৃতি ... ৭২
সাহিত্যে প্রগতির পথে বাধা ... ৭৬
সাহিত্যিকের দায়িত্ব ... ৮০

মুখবন্ধ

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই নিবন্ধ সংকলনের (চেতনার দাসত্ব) অধিকাংশ লেখাই ১৯৩৭-৪১ সালের মধ্যে রচিত। সে সময় যে-সমস্যাগুলি দেশ এবং দেশের জনগণের সামনে ছিল, সেই সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি নিজের কায়দায় বিচার বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেছেন, কীভাবে চিন্তার দাসত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেশ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে এবং নব-নির্মাণের পথে অগ্রসর হতে পারে।

ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা প্রস্তুত নতুন সংবিধান অনুসারে সারা ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিতে বিধানসভার নির্বাচন ১৯৩৬-এর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করে। সংযুক্ত প্রদেশ (ইউ. পি.) মধ্যপ্রদেশ বিহার বোম্বাই মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যাতে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাঙলা আসাম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও যে কংগ্রেস সবচেয়ে বৃহত্তম পার্টি তা প্রমাণিত হয়। মুসলিম আসনে কংগ্রেস মুসলিম লীগের চেয়ে বেশি আসন পায়। জমিদারদের পার্টি এবং হিন্দু মহাসভা ভীষণভাবে পরাজিত হয়।

কংগ্রেস তার নির্বাচনের ঘোষণাপত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তাদের প্রতিনিধিরা বিধান সভায় ভারত সরকারের আইনগুলি উত্থাপন করতে দেবে না, বরং এই আইনগুলির বিরোধিতা করবে। কৃষি-সংক্রান্ত আইন সংশোধন, কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি তাদের ঘোষণাপত্রে ছিল। নির্বাচনে বিজয়ের পরেই কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ খুব দ্রুত এবং তাড়াহুড়া করে সরকার গঠনের জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু প্রবল বিরোধের জন্যে তা সম্ভবপর হয়নি। গান্ধীজীর প্রয়াসের ফলে গভর্নর কথা দেন, তিনি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর জুলাই, ১৯৩৭-এ বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারগুলি জনসাধারণকে কিছুটা নাগরিক অধিকার দেয়। প্রগতিশীল সংগঠনগুলি এবং পত্র-পত্রিকাগুলির ওপর থেকে প্রতিবন্ধকতা তুলে নেয়া হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু দ্রুত কংগ্রেস সরকারের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচন-ঘোষণাপত্রে যে-সব প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, তা কার্যকরী করার ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা জনসাধারণকে এ-কথা বোঝানোর জন্যে অনেক বেশি শক্তি ব্যয় করতে লাগলেন, সংসদীয় কায়দায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনসাধারণের সমস্ত দাবি পূরণ করা যেতে পারে। তাঁরা গণ-

আন্দোলনগুলির বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করতে লাগলেন, গণসংগঠনগুলিকে—বিশেষ করে কৃষক সভাকে ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দিতে লাগলেন। কৃষকদের মিছিলগুলিকে শান্তি এবং শাসনব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে বলে মনে করতে লাগলেন। তাঁরা একথাও বলতে লাগলেন, তাঁদের সরকার গঠন হওয়ার জন্যে সমস্ত পরিবেশ এবং পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ভারত সরকার আইনকে শিকেয় তুলে রাখল। এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে লাগল, যেন সংঘর্ষ না করেই স্বরাজ পাওয়া যাবে।

ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী বলপূর্বক যে-সংবিধান দেশে চালু করেছিল, কংগ্রেসী সরকারগুলি তা ধীরে ধীরে কার্যকরী করতে লাগলেন। তাঁরা ব্রিটিশ আমলা-তন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলেন এবং শ্রমিক-কৃষকদের দাবিগুলিকে উপেক্ষা করতে লাগলেন। ফলে শ্রমিক-কৃষকরা খুব দ্রুত বৃহত্তর আন্দোলনের পথ বেছে নিল। এই আন্দোলনগুলিকে সংগঠিত করার ব্যাপারে রাহুল সাংকৃত্যায়নের অবদান ছিল। তিনি স্বয়ং কংগ্রেসী সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির শিকার হন। পাটনাতে ২৩ আগস্ট ১৯৩৭-এ ষাট হাজার কৃষকের জমায়েত হয় এবং নভেম্বর, ১৯৩৭-এ এক লক্ষ কৃষকের জমায়েত বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। সারা দেশ জুড়ে কৃষক আন্দোলন এক তীব্র রূপ নিচ্ছে দেখে কংগ্রেস নেতৃত্ব কৃষকসভার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং তাকে পঙ্গু করার জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। বিহারে কৃষক সভার বিরুদ্ধে তাঁরা খেতমজুর সভা সংগঠিত করেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে যেমন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করার সবরকম চেষ্টা করে, তেমনি অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্‌কে দেয়। তাদের প্রত্যক্ষ প্রেরণাতেই ডিসেম্বর, ১৯৩৭-এ জমিদারদের অখিল ভারতীয় সম্মেলন হয়। এবং ৩ এপ্রিল, ১৯৩৯-এ 'অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব ল্যাণ্ড লর্ডস' স্থাপিত হয়। রাজা এবং নবাবদের সংঘ 'চেম্বার অব প্রিন্সেস'-কে ১৯৩৮ সালে পুনরায় সংগঠিত করা হয়।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই নিবন্ধ সংকলনের প্রথম দশটি প্রবন্ধে তৎকালীন এ-সব সমস্যাগুলির কম-বেশি উল্লেখ আছে। এবং সে-সমস্যাগুলি আজও তেমনি অটুট আছে এবং জটিল আকার ধারণ করেছে। 'দিমাগী গুলামী' (চেতনার দাসত্ব)-নামক প্রথম প্রবন্ধেই তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেন, 'মানসিক দাসত্ব প্রগতির পথে সবচেয়ে বাধাস্বরূপ। আমাদের দুঃখ-কষ্ট, আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা এত বেশি এবং জটিল যে, অত্যন্ত মুক্ত মনে সে-সমস্যাগুলি নিয়ে যদি আমরা ভাবনা-চিন্তা না করি, তাহলে এই সমস্যাগুলি অতিক্রমের পথও আমরা খুঁজে পাব না।' তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শোষকশ্রেণী বিভিন্নভাবে চেতনার দাসত্বের জন্ম দেয়।

এই সংকলনে আর যে চারটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে, তা নেয়া হয়েছে 'রাহুল নিবন্ধাবলী' থেকে। 'প্রেমচন্দ স্মৃতি' এবং 'আমি কী করে গল্প লেখক হলাম'—এ দুটি স্মৃতিচারণমূলক। কিন্তু এর মধ্যে এমন কিছু তথ্য আছে, যা অত্যন্ত মূল্যবান। বাকি দুটি প্রবন্ধ হিন্দি সাহিত্য এবং পত্র-পত্রিকার সমস্যার ওপর লেখা।

আমি আশা করি, এই নিবন্ধ সংকলন, দেশের সামনে উপস্থিত তৎকালীন সমস্যাগুলিকে অনুধাবন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

৩০ জুলাই, ১৯৯৩
১/১ মণি মুখার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯

অযোধ্যা সিংহ

চেতনার দাসত্ব

(দিমাগী গুলামী)

চেতনার দাসত্ব

যে-জাতির সভ্যতা যত প্রাচীন, তার মানসিক দাসত্বের বন্ধন ততোই অধিক। ভারতের সভ্যতা সুপ্রাচীন, এই প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। আর তাই এই সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে-পথ, সে-পথেও রয়েছে অনেক প্রতিবন্ধকতা। মানসিক দাসত্ব প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। আমাদের দুঃখ-কষ্ট, আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা এত বেশি এবং এত জটিল যে, অত্যন্ত মুক্ত মনে সে-সমস্যাগুলি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা-ভাবনা না করি, তাহলে এই সমস্যাগুলি অতিক্রমের পথও আমরা খুঁজে পাব না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে জাতীয়তার জোয়ার আসে, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষিতদের মধ্যে। এ-জাতীয়তা অনেকাংশে প্রশংসনীয় হলেও, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অন্ধ জাতীয়তাবোধ ছিল। সত্যি-মিথ্যে —যেভাবেই হোক না কেন, তারা দেশের ইতিহাসকে সবচেয়ে সাচ্চা এবং গৌরবময় প্রমাণিত করার জন্যে, অর্থাৎ তাদের মুনি-ঋষি, লেখক, চিন্তাবিদ, রাজরাজড়া এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে বিংশ শতাব্দীর নানা উল্লেখ-যোগ্য ও মহত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করা ছিল তাদের জাতীয়তার এক অঙ্গ। আমাদের ভারতবর্ষের সুপ্রাচীনতা, এবং এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের যারা মানুষ, তাদের সর্বদাই দুনিয়ার অন্যান্য দেশ বা রাষ্ট্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার বাসনায় তাঁরা যেমন-তেমন মনগড়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের নামে যা লেখেন, তা যদি পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনরা স্বীকার না করেন, তাহলে তাঁরা ফতোয়া জারি করেন—ইংরেজ ফরাসি জার্মান ইতালিয়ান আমেরিকান রাশিয়ান ডাচ এবং চেকরা—অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা সব বেইমান। তাঁরা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে আমাদের দেশের ইতিহাস সম্পর্কে মিথ্যা কথা লিখছেন। তাঁরা আমাদের উপাস্য বেদকে সাড়ে তিন হাজার বা চার হাজার বছরের চেয়ে প্রাচীন বলে মনে করেন না (অথচ এই বেদ এক অর্বুদ বছর আগে রচিত হয়েছিল)। এইসব সত্যনিষ্ঠ (!) মানুষরা মনে করেন, যদি তাঁরা কোনো-ভাবে আমাদের সভ্যতা আমাদের গ্রন্থ এবং আমাদের মুনি-ঋষিদের পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ বলে প্রমাণিত করতে পারেন, তাহলে আমাদের কাজ হাসিল হবে—আমাদের ইচ্ছে পূরণ হবে। তাহলে বোধহয়, সারা বিশ্ব আমাদের ঐতিহ্যের সুপ্রাচীনতা দেখে আর বাকবিতণ্ডা না করে আমাদের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেবে। আর যদি স্বাধীনতা অর্পণ না করে, তাহলে আমাদের তরুণরা প্রাচীন সভ্যতার যাঁরা নির্মাতা, তাঁদের রক্তের উত্তরসূরী হয়ে তাঁদের মান-সম্মান রক্ষার জন্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে। তারা তাদের রাষ্ট্র এবং জাতির

উন্নতির জন্যে একের পর এক মহত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের জন্যেও কুণ্ঠিত হবে না। কাজেই আমাদের স্বাধীনতা হাসিল করতে আর কতদিন লাগবে? আজকে আমাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র, নতুন নতুন কামান এবং মেসিনগান, সমুদ্রের নিচের সাবমেরিন বা আকাশে প্রলয় সৃষ্টিকারী উড়োজাহাজ না-ই থাকুক, কিন্তু, আমরা যদি ভোজ রাজার মতো কাঠের তৈরি উড়ন্ত অশ্ব এবং শত্রুর যে নীতিজ্ঞান, সেই নীতিজ্ঞানকেই যদি বারুদ বলে প্রমাণিত করতে পারি, তাহলে আমাদের আর ভাবনা কি! আমাদের এই মূর্খতার কোনো শেষ—কোনো তল নেই। আমরা আমাদের পূর্বজদের ঐশ্বর্য—গরিমা নিয়ে গর্ব করে অর্ধেক উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ব্যয় করে দিই।

প্রাচীনকালের ঐতিহ্যের জন্যে আমরা এমন গর্ব অনুভব করি, যার ফলে অতীত ঐতিহ্যের শৃঙ্খলে ভীষণ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এবং এমন উত্তেজনা অনুভব করি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের কথাবার্তা—উপদেশগুলিকে বিনা দ্বিধায় চোখ বুজে গ্রহণ করে নিই। বারুদ এবং উড়নচাকতির কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে কে জানে, কিন্তু ধর্মের অন্ধকারের মধ্যে সবাই কালো বেড়াল দেখে। আর এ-দেখা তাদের কে ঠেকাবে। ধর্মের ষোলো আনাই ঠিক কিনা, তার জন্যে কোনো প্রশ্ন নেই, মাথাব্যথা নেই, সত্যিমিথ্যে যাচাই করারও ইচ্ছে নেই। পুরো বদমাইশি ব্যাপার। সে তার নিজস্ব কৌশল, টাকা-পয়সা, মিথ্যাচার এবং নানা ধরনের প্রলোভন মারফত কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষকে সম্পূর্ণভাবে হাতের মুঠোয় করে একটা বেহায়াপনার তত্ত্ব কায়েম করেছে। যার ফলে হাজার হাজার ছোট-বড়, শিক্ষিত এবং মূর্খ, কৃষ্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ ভেড়ারপাল হাড়িকাঠে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর সারা জীবন ধরে এই শয়তানরা মৌজ করে। মৃত্যুর পরে তাদের অনুগামীরা তাদের আরও উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত করতে থাকে। শতাব্দী ধরে এই অনুগামীর দল ধূর্ত পৃথিবীর এই মহামানব এবং তাঁর শুচিশুভ্র আত্মার প্রচার চালায় এবং তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলতে সফল হয়। পুরানো দিনের কথা না হয় ছেড়েই দিন। আমি এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, যাদের অনেকেই আর ইহ জগতে নেই, অনেকে এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের ভেতরকার জীবন যেমন ঘৃণ্য, তেমনি স্বার্থপর এবং অসংযমী। কিন্তু বাইরের জীবন—ভক্তরা তাঁকে দর্শন করতে আসে, তাঁর সঙ্গে মধুর আলাপ-আলোচনায় নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। খুব কাছ থেকে দেখুন, দেখবেন, এইসব ধার্মিক মহাত্মাদের মঠ এবং আশ্রম হচ্ছে প্রচারের জন্যে মুক্ত পাঠশালা। ধর্ম প্রচার হচ্ছে ভেক, হাজার হাজার টাকা রোজগারই হচ্ছে মুখ্য। অনেকেই ব্যবসার খাতিরে এক সঙ্গে জুড়ে আছে। অযোধ্যায় এক মহাত্মা ছিল। শ্রীরামচন্দ্র তার প্রতি এমন প্রসন্ন ছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠে পদার্পণ করে তার পাণিগ্রহণ করেন। হ্যাঁ, পাণিগ্রহণ করেছেন!

প্রথমে পুরুষ ছিল, পরে ভগবানের কৃপায় প্রিয়তমা রূপে বিবর্তিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে কি মুশকিল! তিনি যখন শিলাখণ্ডকে মানুষের রূপে পরিবর্তিত করতে পারেন, তখন পুরুষকে স্ত্রী রূপে রূপান্তর করা তাঁর পক্ষে এমন কি কঠিন কাজ? এমন ধরনের পরিবর্তন আজকাল তো আকছার দেখা যায়।

একটি নতুন মতবাদ এখানে পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে লালিত হয়ে আসছে। এই মতবাদ হচ্ছে, দুনিয়াতে যত রকম বোকামি ভূত-প্রেত যাদুমন্ত্র আছে—সবকিছুকেই বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা। বেকুব ভারতীয়রা মনে করে, অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ থেকে যারা পাশ করে বেরোয় তারা গাধা হয়ে বেরোয় না, তারা সবাই জ্যাক আর জনসনের মতো, বিজ্ঞান ছাড়া আর অন্য কোনো কথা বলে না। এই সব আধ-কাঁচা পণ্ডিতরা তাদের অসমাপ্ত জ্ঞানের ওপর দাঁড়িয়ে ভূত-প্রেত দেব-দেবী সাধু-পূজাপাঠ—সমস্ত কিছুকেই, তিরিশ বছরের অতীতের যে বৈজ্ঞানিক 'সিদ্ধান্ত', তাকে সত্য বলে প্রমাণিত করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। যাই হোক, তাদের সেই সিদ্ধান্তগুলির শতকরা ৭৫ ভাগ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি অন্ধ ভক্তজনদের জন্যে সেই প্রাচীন বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মবাক্য জুড়ে দিয়ে বই তৈরি হচ্ছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস—সময় এবং দেশগত হিসেবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে, নিশ্চয়ই প্রাচীন। আর আমাদের মূর্খামির লিস্টও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে তেমনি বিরাট। অন্ধ জাতীয়তা এবং তার ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরা অতীতের প্রতি আমাদের প্রচণ্ড ভক্তি সৃষ্টি করেছে। আর আমাদের এইসব মূর্খামিকে লালিত-পালিত করার জন্যে তথাকথিত পচা-গলা বিজ্ঞানের থিওরিগুলির এবং শ্বেতাঙ্গদের উদাহরণ দেয়। কাজেই কেন আমরা আমাদের মগজকে বিক্রি করে অন্নের সংস্থান করব না? যাদের এখানে উড়োজাহাজ নেই, কাঠের ঘোড়া আকাশে ওড়ে, যাদের এখানে বারুদ এবং আগ্নেয়াস্ত্র নেই, মুখ থেকে নির্গত অগ্নি-হল্কা দ্বারা কোটি কোটি শত্রুকে মুহূর্তের মধ্যে ভস্ম করে দিতে পারে, যাদের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তা এবং আত্মপ্রবঞ্চনা দেখে আজও সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়, তারা কি কখনও কোনো মিথ্যে কথা লিখতে পারে? তেপাইয়ের ওপর ভূতকে আহ্বান করা, মেসমেরিজম, হিপ্নোটিজম ইত্যাদির মারফত প্রথমত বৈজ্ঞানিক কায়দা-কৌশলে আমাদের ধীরে ধীরে মূর্খতার সংস্পর্শে আনছে—তার বিস্তার ঘটাচ্ছে। আর বর্তমানে তো বিজ্ঞানের পুরস্কার বিজেতারা সর্বত্র হরস্বরাম এবং হরিরাম ব্রহ্মার বিভূতি বিতরণ করছে। এমন কি নোবেল পুরস্কার বিজেতা অলিওরের মতো মানুষও শেষ পর্যন্ত ভূত-প্রেতের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন, এবং মনপ্রাণ দিয়ে তা মানুষের মধ্যে প্রচার করছেন। তাহলে আর আমাদের দেশের লোকের অপরাধ কোথায়?

এখনও পর্যন্ত শিক্ষিত মানুষরা ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞানকে মিথ্যে বলে মনে করেন, আর তা অনেকেই সমর্থন করে। জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ছাপার

জন্যে আমাদের পত্রপত্রিকা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গত ২৭ আগস্ট 'সার্চলাইট' পত্রিকা এক জ্যোতিষী মহারাজের আবহাওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দিয়েছে। তাহলে আর লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে পুনায় কেন যন্ত্র কেনা হচ্ছে আর বিশেষজ্ঞ রাখার প্রয়োজন হচ্ছে? এখন তো স্বদেশী জামানা। কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। জ্যোতিষীদের এখন উচিত, একটা বড় ধরনের ডেপুটেশন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তাদের অন্তত এতটুকু বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, কংগ্রেসের ছ'টি প্রদেশে এমন মন্ত্রী খুব কমই আছেন, যাঁরা জ্যোতিষী বিশ্বাস করেন না। জ্যোতিষীরা কম মাইনে নিয়ে দেশ-সেবার জন্যে নিশ্চয়ই রাজি থাকবেন। তাহলে স্বদেশী উপায় থাকতে কী এমন প্রয়োজন আছে, আবহাওয়ার খবরের জন্যে যন্ত্রের। কী দরকার আছে ভূমিকম্পের জন্যে সিস্মোগ্রাফ ইত্যাদি তরঙ্গ পরিমাপক যন্ত্রের, যার দাম হাজার হাজার টাকা। আর কী দরকার পনেরোশো টাকা মাইনের বিশষজ্ঞের? জ্যোতিষীরা তাঁদের কাজ খুব কুশলতার সঙ্গে করতে পারেন। তাঁদের না প্রয়োজন আছে যন্ত্রের, না আছে বাইরে থেকে সংবাদ গ্রহণের। একটা স্থানে বসেই তাঁরা সমস্ত কথা বলে দিতে পারেন। আর সবচেয়ে প্রশংসনীয় কথা হচ্ছে, একই ব্যক্তি অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি—দুটি কথাই বলে দিতে পারবেন —সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের কথাও। স্বরাজ আসতে যদি দেরি হয়, তাহলে নেতাদের জন্মকুণ্ডলী দেখে বলে দেবেন, স্বরাজ কখন আসবে। সম্প্রতি—এ বছরেই একজন মহারাজা ব্রিটিশ বাদশার সিংহাসন দেখার জন্যে বিলেতে যেতে চান। কিন্তু দুষ্ট-গ্রহ তাঁকে খুব উত্যক্ত করছিল। আর দুষ্ট-গ্রহ থেকেও বেশি তাঁর মাতৃদেবী উত্যক্ত করছিলেন। এক জ্যোতিষী এসে মেষ-মিথুন রাশি গণনা করে মহারাজকে আশ্বস্ত করে, কোনো গ্রহ খারাপ নেই। আর মহারাজের মাতৃদেবীকেও বলে, মহারাজের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। সবাই খুশি হয়। এই বিচার করে জ্যোতিষী পাঁচ হাজার টাকা পান। বলুন, এর চেয়ে সস্তায় জীবন-বীমা আর কোথায় হতে পারে? এমন ঘটনা ঘটলে আর একটা লাভ হবে। প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারের একটি করে রাজ জ্যোতিষী আর দশ-পাঁচটা করে সহকারী জ্যোতিষী থাকলে মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের আর জ্যোতিষীর জন্যে যত্রতত্র হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না। সহধর্মিণী এবং বাড়ির ছোট-বড় সবার জন্যে প্রতি বছর বর্ষফল পেয়ে যাবেন। স্বদেশী ব্যবসায়ে আপনাদের উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। আর এর চেয়ে খাঁটি স্বদেশী ব্যবসা আর কি হতে পারে? যাঁদের আত্মা মগজ দেহ আর গতর—সবকিছুই একেবারে ষোলোআনা স্বদেশী। আমাদের মিথ্যে বিশ্বাস কি দু'-একটা যে, একটা ছোট্ট লেখায় তা লেখা যাবে? আমাদের এ-দেশে মিথ্যা বিশ্বাস এত যে, তার ফাইলের অন্ত নেই। এবং সবচেয়ে ধন্যবাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে, এই মূর্খতার

ভীষণ ভারি বোঝা মাথার ওপর নিয়ে আমাদের নেতারা মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে চান। তাঁদের অগাধ বিশ্বাস বৈকুণ্ঠের ভগবান আকাশের নবগ্রহ এবং ইহলোকের জ্যোতিষী ওঝা এবং ধূর্তরা তাঁদের সঙ্গে পাড়ি জমানোর জন্যে সঙ্গ দেবে।

আমাদের জাতপাতের ব্যবস্থার কথাই ধরুন। এই জাতপাত আমাদের মুনি-ঋষিদের আবিষ্কার, যে আবিষ্কারের জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করি। জাতীয় চেতনার জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের দু'-চারজন নেতা যদিও জাত-পাতের বিরুদ্ধে বলেছেন, কিন্তু এখনও আমাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অধিকাংশই আমাদের মুনি-ঋষিদের এইসব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যকে সম্মান করতে আগ্রহী। নেতারা জানেন, এই জাতপাত আমাদের মধ্যে বিভেদ এবং কলহ সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সাহায্য করছে। কয়েক বছর আগে জাতীয় সংগঠনের অভ্যন্তরেও এর প্রভাব পড়েছে, ফলে এখন অনেকেরই তা ত্যাগ করতে কষ্ট হচ্ছে। আমি অন্যসব নেতাদের কথা বলছি না। কংগ্রেসের নেতাদের কথাই বলছি। তাঁরা ভীষণভাবে চেষ্টা করছেন, কীভাবে জাতীয়তা এবং জাতপাতকে —ডান এবং বাঁ-কাঁধে নিয়ে হাঁটবেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পেরেছেন, এ-দুটিকে নিয়ে চলা সম্ভব নয়। জাতপাত ভাঙতে না পারলে পরিচ্ছন্ন জাতীয়তা আনা অসম্ভব। আপনি যদি জাতপাত ভাঙতে না পারেন, তবে দেখবেন আপনার বাস্তব পৃথিবী আপনার জাতপাতের মধ্যেই অবস্থান করছে। বাইরের মানুষের সঙ্গে তো কাজ চালানো গোছের একটা সমঝোতা—একটা আপসরফা আছে। যদি আপনি কোনো পদে অধিষ্ঠিত হন, আর আপনার মধ্যে যদি সততা থাকে, তাহলে আপনার রায় বা মতামতের ওপর আপনার জাতভাইদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হবে। চাকরি-বাকরি দেয়া, সাব-কমিটিতে নেয়া, সুপারিশচিঠি লিখতে পারা না পারা ইত্যাদি বিষয়ে, আপনার জাতকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। মানুষের অন্তরে হাজার রকমের কুঠুরি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেখানে এমন কোনো কুঠুরি নেই যার দুরত্ব অনেকখানি। তার একটিতে জাতপাতের মানসিকতা আছে, আর অন্যটিতে আছে সেই জাতপাত থেকে সম্পর্কহীন জাতীয়তা। যেমন কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রথমেই অনুভব করতে হবে, তাদের সাম্যবাদ গ্রহণ ছাড়া উপায় নেই। তেমনি জাতীয়তার পথে পা বাড়ালে, তাদের জাতপাতের প্রাচীর যে ভাঙতে হবে তা অনুভব করতে হবে। যদি কেউ জাতীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকতে চান, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের জাতভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে চান, তাহলে তিনি জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বস্ত থাকবেন না, অথবা তিনি ব্যর্থ হবেন। নিজের জাতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি অন্য জাতের কীভাবে বিশ্বাস অর্জন করবেন? মন্ত্রীদের বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ জাত-ভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁকে অনায়াসে বদনামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

আমার বুদ্ধিতে বলে, প্রদেশ, রাষ্ট্র ও কংগ্রেসের, এবং ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো, প্রত্যেক নেতা এখনই তাঁদের ছেলে-মেয়ে, ভইাপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নী বা নাতি-নাতনীদের অন্তত জাতপাতের বেড়াজাল ভেঙে বিয়ে-শাদী দিন। যেমন মহাত্মা গান্ধী এবং রাজগোপালাচারী করে দিখিয়েছেন। চোখ বন্ধ করে আমাদের সময়ের জন্যে প্রতিক্ষা করা দরকার। আমাদের মানসিক বা চেতনার দাসত্বের যে-শৃঙ্খল, সেই শৃঙ্খলের প্রতিটি কড়াকে দয়া-মায়া না করে ভেঙে ফেলার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। বাইরের বিপ্লব থেকে অনেক বেশি প্রয়োজন চেতনায় বিপ্লব সংগঠিত করা। আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে উন্মুক্ত তলোয়ার চালাতে চালাতে সমস্ত অন্ধ কুসংস্কার টুকরো টুকরো করে সামনে এগোতে হবে। বিপ্লব এক লেলিহান অগ্নিশিখা, সেই অগ্নিশিখা শুধু গ্রামের ঝুপড়িগুলিকে পুড়িয়ে খাক করে দেবে না, মাটির বা ইঁটের বাড়িঘর-গুলিকেও পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আর আমাদের নতুন পথ ধরে নতুন বাড়ি বানানোর জন্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

গান্ধীবাদ

গত ষোলো বছর ধরে ভারতবর্ষে গান্ধীবাদ নিয়ে খুব হৈ-চৈ হচ্ছে। আর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অধিকাংশ মানুষই গান্ধীবাদের অনেক মতামতের সঙ্গেই সহমত নয়। কিন্তু বিহারকে গান্ধীবাদের একমাত্র সাম্রাজ্য বলে মনে করা হয়। বিহার প্রথম থেকেই বাঙলার অধীনস্থ থাকার দরুন, সমস্ত ব্যাপারেই বিহার পরমুখাপেক্ষী থেকেছে। চাকরি-বাকরি, উকিল-ব্যারিস্টার, অধ্যাপক-শিক্ষক —সমস্ত জায়গাতেই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। অবশ্য সংযুক্ত প্রান্তের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) মতো অন্যান্য প্রান্তেও মাতৃভাষা হিন্দিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষা হিসেবে সরকারি অফিস-আদালতে রাখা হয়েছে, কিন্তু বিহারে তার দশা খুবই দুঃখজনক। সেখানে—হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলের সরকার না-ই করুক, প্রাইভেট সংস্থা, এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেকে হিন্দির দাবিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে, কিন্তু বিহারে হিন্দি ভাষার প্রতি খুব সামান্যই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে হিন্দিভাষীরা গ্রাজুয়েট হয়, তাদের মধ্যে সাহিত্যের কোনো রুচিবোধ দেখা যায় না। আর কারও মধ্যে যদি সাহিত্যের রুচিবোধ থাকেও, তাহলে তার বাঙলাসাহিত্য সম্পর্কে জানার সুযোগ-সুবিধাই বেশি। বিহারের জমিদাররা হচ্ছে সবচেয়ে নিষ্কর্মা, তাদের মধ্যে সংস্কৃতির কোনো বালাই নেই। পৃথিবীর প্রগতি সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞানগম্যি নেই। তাদের দিয়ে এই প্রান্তে কিছু হবে একথা ভাবা নিরর্থক মাত্র। তাই বিহারীরা লাজুক এবং সংকুচিত প্রকৃতির। জনসমক্ষে বক্তৃতা দিতে বা মেলামেশার মারফত নিজেকে তুলে ধরতে তারা ভয় পায়। একটি উন্নতশীল জাতি হিসেবে যে-সব গুণাবলীর দরকার, তার কোনো অভাব বিহারীদের মধ্যে নেই। ১৯২১ সালে বিহারে যে-সব ক্ষুদ্র এবং বড় নেতারা অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে যদি অন্য প্রান্তের নেতাদের তুলনা করেন, দেখবেন, বিহারের অসহযোগীরা এই আদর্শের জন্যে তাঁদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছিলেন। আর এই আদর্শের জন্যে অসংখ্য মানুষ ত্যাগ স্বীকার করেন। এ-কথা বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না, নিজের আদর্শের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে তাঁরা এত বদ্ধপরিকর ছিলেন যে, তা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গেও তুলনীয়। ত্যাগের দৃঢ়তার সঙ্গে বিহারীদের মধ্যে আর একটি গুণ আছে, তা হচ্ছে নেতা হওয়ার জন্যে সেখানে অত লড়াই-ঝগড়া করতে হয়নি। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই যে অভাব, তা তাদের ভালো গুণের মধ্যে একটি। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিহারের জাতীয় আন্দোলনের কর্মীরা শৃঙ্খলাবোধকে আগাগোড়া মর্যাদা দিয়ে এসেছে।

বিহারের সাম্যবাদীরাও, যাঁরা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে মৌলিক প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করতেন, তাঁরাও তাঁকে সম্মান করতেন। আর যতদূর একসঙ্গে চলা সম্ভব, তাঁর আদেশ মতোই চলতেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্পর্কেও বলা যায়, তিনি বিরোধী মতাবলম্বীদের বক্তব্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, এবং যতদূর সম্ভব মতবিরোধ নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করতেন। যদি দু'জনের মতামতের বিস্তর পার্থক্যও থাকে, তবু তিনি তিক্ততা সৃষ্টি হতে দেননি। ত্যাগের জন্যে দৃঢ়চিত্ত, ব্যক্তিগত মহৎ আকাঙ্ক্ষার জন্যে সংযম বোধ, এবং নেতৃত্বের অনুশাসন—এই তিনটি জিনিস যে-কোনো জাতির সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আর এই তিনটি জিনিসই বিহারীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে। ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই, দেখব, বিহার দেশের এক কোণে লুকিয়ে থাকা কোনো বস্তু নয়। হিন্দুকুশ থেকে আসাম, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক রাষ্ট্রকে গঠন করা এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করা বিহারীদেরই কাজ। যদি আমরা ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাই, দেখব, যখন থেকে পাটলিপুত্র (পাটনা) আর দেশের কেন্দ্রবিন্দু থাকেনি, তখন থেকেই ভারতবর্ষ একসূত্রে আবদ্ধ হতে পারেনি। এমন একটি কাজের জন্যে বিহারকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যে লাজুক, যার মধ্যে সংকোচ বোধ আছে, এবং সভাসমিতিতে ভীরুর মতো বসে থাকে, তার পক্ষে কি সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব? স্বীকার করে নিচ্ছি, এগুলি তার ত্রুটি, কিন্তু এ-সব তার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এবং এই সাক্ষী তো ইতিহাসই। গত দেড় শতাব্দী ধরে এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, যার জন্যে বিহারীদের মধে এ-সব কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখন আমাদের সে-সব তাড়ানো দরকার।

হয়তো এ-সব দোষ-ত্রুটি খুব স্বাভাবিকভাবেই রয়ে যায়। কিন্তু গান্ধীবাদ তার নিজস্ব প্রভাবেই এই ত্রুটিকে আরও পাকাপোক্ত করতে চায়। শুষ্ক-মুখ, হতাশ অক্ষিযুগল, মাথা নিচের দিকে নোয়ানো আর ধসা বুক—এরকম ছবি নিয়ে গান্ধীবাদ সামনে হাজির হয়। আর এই গান্ধী যদি তাঁর বিহারী ভক্তদের ওপর এরকম একটা ছাপ ফেলতে চান, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে! গান্ধীবাদ ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, তার কারণ হচ্ছে গান্ধীবাদ আপামর জনসাধারণের কাছে বিপ্লবের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং তার জন্যে আত্মত্যাগের চেতনা সৃষ্টি করেছে। এ কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। এজন্যে ইতিহাস চিরদিন গান্ধীজীর নাম অত্যন্ত সম্মান এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দেশের অনেক ক্ষতিও করেছেন, তা হলো, আমাদের আবহমান কাল থেকে চলে আসা মূর্খতার প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন। এ-কথা

বিনা দ্বিধায় স্বীকার করছি, তাঁর প্রথম অবদানটি ইতিহাসে চিরদিন বেঁচে থাকবে এবং দ্বিতীয় অবদানটি মানুষ এক শতাব্দীর মধ্যে ভুলে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে, এবং আগামী বিশ-ত্রিশ বছর আমাদের দেশকে এর ফল ভুগতে হবে।

সবচেয়ে যে-মূর্খতাকে গান্ধীজী হাত ধরে মাটির ওপর দাঁড় করিয়েছেন—তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, তা হচ্ছে ধর্মের গোঁড়ামি। অনেকে বলবেন, গান্ধীজী অচ্ছুৎদের আন্দোলন করে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায় বিপ্লব সংঘটিত করেছেন। অচ্ছুৎ-প্রথার জন্যে মালব্যজীও তাঁর নিজের কায়দায় আন্দোলন করতে চেয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ লক্ষ টাকা খরচ করে এক নতুন বিশ্বনাথ তৈরি করতে চেয়েছেন। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা কি বিংশ শতাব্দীর একজন গণ্যমান্য হিন্দু নেতার সবচেয়ে বড় মূর্খতা নয়? যখন দেখি গান্ধীজীর অচ্ছুৎ-আন্দোলনের সঙ্গে মুনি-ঋষি এবং তাঁদের গ্রন্থ গীতা ইত্যাদির মাহাত্ম্য এবং গুণগান করা হচ্ছে, তখন তাঁর অচ্ছুৎ আন্দোলনের গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পায়। যে-গ্রন্থসমূহের মধ্যে অচ্ছুৎদের সম্পর্কে নানা বিধান দেয়া আছে, যে মুনি-ঋষিদের আশ্রমের আশেপাশে মানুষ বলে পরিচিত দাসদাসীদের ওপর শত-সহস্র বছর ধরে অমানুষিক অত্যাচার চলে আসছে, এবং যে-অত্যাচার দেখেও যাদের ধ্যান ভঙ্গ হয়নি, সেইসব গ্রন্থ দিয়ে অচ্ছুৎদের কীভাবে সাধক বানানো যাবে? গান্ধীজীর বিপক্ষে যে-সব বক্তব্য যায়, তার নতুন ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী কাজ চালাতে চেয়েছেন। তাঁর পূর্বেও ভারতবর্ষে এমন অনেক সংস্কারক এসেছেন, যাঁরা এ-কৌশলই গ্রহণ করেছেন—এভাবেই কাজ করেছেন। কিন্তু এ তো পচাগলা ক্ষতের ওপর মলমের প্রলেপ দেয়ার মতো। এই সব শাস্ত্র-গ্রন্থ এবং মুনি-ঋষিদের নিয়ে গৌরব অনুভব করা, আদতে অচ্ছুৎ-প্রথাকে আরও দৃঢ় করারই উপায় হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীজীও চাইতেন শাস্ত্র এবং মুনি-ঋষিদের ওপর যেন কোনোভাবে কলঙ্ক লেপন করা না হয়। তবে তার সঙ্গে মুনি-ঋষিদের এই অত্যাচারও যেন আমাদের সমাজ থেকে বিদায় নেয়।

শুধু তাঁর বচন-প্রবচন এবং আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই নয়, বরং সম্মিলিত প্রার্থনা করেও তিনি ঈশ্বর ভক্তিকে অনেকখানি পরিপুষ্ট করেছেন। মানব সমাজে আর্থিক এবং সামাজিক—যে দুটি অসাম্য বিরাজ করছে তথা ধর্মের গোঁড়ামিকে জিইয়ে রাখার জন্যে ঈশ্বরের ভূমিকা যে সবচেয়ে প্রধান, তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বে সর্বকালে সব বিপ্লবীই এ-কথা খুব ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তাঁরা বিপ্লবে ঈশ্বরকে স্থান দেননি। বিশ্বকে যে-ঈশ্বর ধ্বংস করেছে, গান্ধীজী সেই ঈশ্বরের কথা বলেন, আর অন্যদিকে মানুষকেও উদ্যোগী হওয়ার জন্যে শিক্ষা দেন। অবশ্যই যাঁরা স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী এবং যাঁরা চিন্তা

ভাবনা করার ক্ষমতা খুইয়ে বসেছেন, তাঁরা গান্ধীজীর ঈশ্বরভক্তি থেকে অনেক কিছু লাভ করেন। কিন্তু দেশের দুঃখ-কষ্ট মিথ্যা নয়—তা বাস্তব সত্য। ঈশ্বর ভক্তি হয়তো তাঁদের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করবে, কিন্তু প্রতিটি জটিল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পেতে এবং চিন্তা করতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের জাতীয় নেতারা জেলের মধ্যে বছরের পর বছর নিশ্চিন্ত অবসর পেয়েছেন। যদি তাঁরা চাইতেন, এই জেল-জীবনে ভারতবর্ষের আর্থিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করতে পারতেন এবং সে সম্পর্কে যে বিশাল সাহিত্য আছে, তা নিয়ে পড়াশুনা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের সামনে ছিল গান্ধীজীর সত্য যুগ এবং রামরাজত্ব। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের শয়তানী সাহিত্য—অর্থশাস্ত্র এবং বিজ্ঞান তাঁদের কী কাজে লাগবে? গীতার একটি শ্লোক প্রতিদিন আবৃত্তি করলেই যথেষ্ট। বিহারে এমন অনেক সম্মানিত নেতা আছেন, যাঁরা এমন-এক গবেষণা কাজে দিনপাত করেছেন, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'ক' এবং 'ষ' কতবার ব্যবহৃত হয়েছে। বলুন, লেখা-পড়া তাদের কোন কাজ লাগবে। যাঁরা ১৯২১ সালে কলেজ ছেড়েছেন, তাঁরা বিজ্ঞানে এবং বিদ্যা অর্জনে তাঁদেরই ছাত্রজীবনে শীর্ষস্থানে ছিলেন। গত ষোলো সতেরো বছর ধরে এঁদের মগজ থেকে বেকুবি ছাড়া আর এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা এবং সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে? মুশকিল হচ্ছে, তাঁরা কলেজে যা পড়েছিলেন, তা তাঁরা কলেজের দরজার সামনেই ঝেড়ে ফেলে এসেছিলেন। তাঁরা জানতেন না, একদিন সরকারের লাগাম তাঁদের হাতে আসবে, আর সে-সময় গীতা এবং রামায়ণ কোনো কাজেই আসবে না। সে-সময় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যে শাখাগুলির সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সে-জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন হবে। আর সে-সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি বা জ্ঞান না থাকলে, কংগ্রেসের মন্ত্রীরা তাঁদের বিভাগীয় উচ্চপদস্থ অফিসারদের হাতের মুঠোয় থাকবেন। কারণ পদাধিকারীরা তাঁদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। প্রতিটি মতামতের যথার্থতাকে প্রমাণিত করার জন্যে তাঁরা তথ্যযোজনা এবং সিদ্ধান্তের সপক্ষে বইয়ের পর বই পেশ করে দেবেন, আর আমাদের মন্ত্রীদের শুধু ফাইলের ওপর স্বাক্ষর দেবার ক্ষমতাই থাকবে। খুব বেশি হলে, সভাসমিতিতে উল্টোসিধে বৈপ্লবিক আদর্শবাদ এবং ত্যাগ সম্পর্কে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা ঝাড়বেন। বক্তৃতা দেয়া খুব সহজ কাজ, কারণ তার জন্যে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না—লেখাপড়ারও বিশেষ প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের নেতাদের এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ি গান্ধীবাদ। যতদিন পর্যন্ত এই অন্ধভক্তি দূর না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের ওপর ভরসার কথা ভাবা বাতুলতা।

গান্ধীজী বলেন, নেশাকে ভারতবর্ষ থেকে চিরতরে বিদায় করতে হবে। তাড়ি হোক, দেশী মদ হোক, গাঁজা-ভাঙ হোক—সব কিছুকেই দেশ থেকে

ঝেঁটিয়ে বিদায় করা দরকার। সিগারেট এবং তামাক এখানে দীর্ঘদিন চালু থাক, তিনি চান না। ইউরোপিয়ানদের জন্যে সামান্য পরিমাণ বিদেশী মদ আনার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। বিহারের পাঁচ কোটি টাকার বাজেটের ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আমদানি হয় মদ থেকে। তিনি তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিতে প্রস্তুত। যদি এই টাকার অভাবে স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যায় ছেলেরা আধুনিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়, তবুও। তাঁরা চান না মদ থেকে অর্জিত পাপের পয়সা দিয়ে ছাত্রদের মগজকে কলুষিত করা হোক। সম্প্রতি—এই গতকাল পর্যন্ত গান্ধীজী মিল-মালিক, জমিদার এবং তাবড় তাবড় সাহুকারদের উপদেশ দিয়েছেন, আমরা চাই না সম্পত্তি তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক। আমরা চাই, তোমরা নিজেদের দরিদ্রতার অভিভাবক বা গার্জিয়ান বলে মনে কর। তাই এখন অভিভাবক বা গার্জিয়ানরা গান্ধীজীকে ভরসা দিয়ে বলতে পারে, আমরা অভিভাবক হিসেবে থাকতে চাই। আমাদের ওপর আর যেন নতুন নতুন ট্যাক্স বসানো না হয়, জমিদারী প্রথা যেন বহাল তবিয়তে থাকে এবং জমিদারদের কোনো ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ওপর যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়। একদিকে আবগারী থেকেও আয় বন্ধ হয়ে যাবে—আর অন্যদিকে অভিভাবক জমিদার এবং মিল-মালিকরা তো গান্ধীজীর আশীর্বাদ পেয়ে গিয়েছেন। এখন মুখ বন্ধ করে প্রেমভবনে বসে মালা জপ কর।

গান্ধীজী তাড়িকেও মদের সমপর্যায়ে রাখতে চান—তাড়িকে গাছ থেকে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে পান করতে হবে, গুড় তৈরি করে ফেলতে হবে, তা দু'-একদিনের জন্যে রোখার অনুমতি দেয়া হবে না। নেশাকে তো রুখতে হবে! আফিমের মতো নেশাকে রোখার জন্যে যদি বাধ্যবাধকতা করা যায়, তাহলে তা খারাপ ব্যাপার নয়। মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। তা বন্ধ করা যথার্থ। যা পান করলে মানুষ সামান্য নেশাগ্রস্ত বা এ্যালকহলিক হয়, সে-সব কিছুকেই বুঝিয়ে সুজিয়ে বা জোরপূর্বক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর তাতে যদি প্রদেশের আমদানি একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে তাকে কতটুকু পর্যন্ত রাজনীতি বলে মনে করা হবে? তাড়ি খেলে যদি সামান্য—হালকা ধরনের কোনো নেশা হয়, আর তা যদি খাদ্য হিসেবে দেহের পুষ্টিসাধন করে, তাহলে তাকে বেআইনী করার জন্যে এত তৎপরতার কি প্রয়োজন? তাড়ি বা মদ ছাড়ানোর জন্যে উপায় বের করা দরকার। একটা পর্যায় পর্যন্ত হালকা নেশা কি প্রভাব ফেলে তা যাচাই করা এবং যাতে নেশা হিসেবে তার নিয়মিত পরিমাণ বৃদ্ধি না পায় সে চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাড়ির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর শক্তি নিহিত আছে। দেহাতে বহু মানুষ শুধুমাত্র স্বাস্থ্য এবং দেহকে মজবুত রাখার জন্যে বছরে দু'-একমাস তাড়ি খায়। আর সত্যি সত্যি তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রত্যক্ষ করা যায়। তাড়িকে মদ এবং আফিমের

পর্যায়ভুক্ত করা এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে বেআইনী করার জন্যে জোর দেয়া এ-সব গরিব মানুষদের জীবনধারণের পক্ষে অন্যায় স্বরূপ। তাড়ি খেয়ে তারা শারীরিক পুষ্টি সাধন করে। আবগারি বিভাগকে বন্ধ করার আগে তিনটি বিষয় সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে—এক, তাড়ি খাওয়ার লাভ তা নেশাকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। দ্বিতীয়, অভ্যস্ত নেশাখোরদের তাড়ির মতো কোনো পদার্থ দিয়ে তাদের পুরানো নেশার হাত থেকে মুক্ত করা। তৃতীয়, এই আবগারি থেকে যে বিশাল আয় হয়, তা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে। দুটোই বন্ধ হয়ে যাক, তা ঠিক নয়। প্রথমে এর জন্যে কোনো একটা পথ বের করে, তা বন্ধ করা ঠিক হবে। যদি ব্যক্তিগত মালিকানা উঠিয়ে দেয়া হয়, এবং মানুষের শ্রমের মাত্রা বৃদ্ধি করে যদি জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করা যায়, তবে আবগারি থেকে আমদানির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গান্ধীজী ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বোধহয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ পুষ্ট বলে মনে করেন, সেজন্যে .সেই পবিত্র সম্পত্তির ওপর তিনি কীভাবে হস্তক্ষেপ করবেন! এর সোজা-সাপ্‌টা উত্তর, যদি আমদানি কম হয়ে যায়, তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দাও।

গান্ধীজী এ-কথাও বলেন, পাঠশালাগুলিকে স্বাবলম্বী করে তোলো। কোন ধরনের পাঠশালাগুলিকে তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেন? প্রাইমারির ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত, যে শ্রেণীগুলিতে ছ' থেকে বারো বছরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে? হ্যাঁ, গান্ধীজী যদি এ-নিয়ম তৈরি করেন যে, কুড়ি বছর বয়সের পর পাঠশালায় এলে, তাদের অর্ধেক শ্রমদানে পাঠশালা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে, তাহলে ঠিক আছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সব সময়েই মা-বাবা এবং রাষ্ট্রের ওপর তাদের শিক্ষার ভার ছেড়ে দেবে। পাঠশালাকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যে তাদের ওপর ভরসা করার অর্থ হচ্ছে, শিশু জন্মগ্রহণ করার পর যদি তাকে স্বাবলম্বী হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়—অনেকটা সেরকম। ইচ্ছে করলে ট্যাক্স আদায় করে শিক্ষা বিভাগে ব্যয় কর, কিংবা গ্রামের শিক্ষকদের আটা-চাল এবং পয়সা চাঁদা করে তুলে দেয়া হোক। কিন্তু স্বাবলম্বীর এ-রকমের ধারণা কিভাবে ওঠে? আসল কথা হচ্ছে, গান্ধীবাদ আধুনিক বিজ্ঞান এবং শিক্ষার উন্নতিকে শয়তানের বদমাইশি বলে মনে করে। আর তা প্রচারের জন্যে তাদের হৃদয়ের মধ্যে কোনো সহানুভূতি নেই। তাদের মতামত অনুযায়ী, তুলসীদাসের রামায়ণ শোনা এবং পাঠ করা একজন মানুষের কাছে যথেষ্ট শিক্ষার সামগ্রী। মাটি এবং জল সমস্ত রোগের মহৌষধ, যা রামায়ণে আছে। হাতপাতাল ভেঙে ফেলা, ডাক্তারদের বরখাস্ত করা উচিত, আর মেডিক্যাল কলেজে 'টু লেট'-এর বোর্ড টাঙিয়ে দেয়া দরকার। বস্তুত ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের কাছে এ-সবের এমন কি প্রয়োজন আছে? 'জাকো রাখে সাইয়া মার ন সকি

হ্যাঁয় কোয়' (রাখে হরি মারে কে)—এ প্রবচন তো আমাদের ঝোলায় আছেই। যার মৃত্যু কপালে লেখা আছে, তাকে ডাক্তার বাঁচাতে পারে না। সুখ-দুঃখ তো ভগবানের দান, তা কে বরবাদ করতে পারে ?

কয়েদীদের জন্যে জেলখানা এবং শান্তি বজায় রাখার জন্যে পুলিসের কোনো আবশ্যকতা নেই। বোধহয় তাঁরা মনে করেন, হাজত, জেলখানা, পুলিস দেখে দেবস্বভাব মানুষেরও প্রকৃতি সহজে বিকৃত হয়ে যায়। যদি এখন জেল এবং পুলিসকে হটিয়ে দেয়া যায়, তাহলে আপনাকে আর দরজায় তালা লাগাতে হবে না, ঘরে সিন্দুক রাখারও প্রয়োজন নেই। দু-'চার হাজার টাকা ইচ্ছে করলে বারান্দার টেবিলের ওপর রেখে ছেলে-মেয়ে-বৌকে নিয়ে কাছে পিঠে বিনা দ্বিধায় হাওয়া খেয়ে বেড়িয়ে আসতে পারেন। দেবতার মতো যাদের স্বভাব-চরিত্র, তারা কি কাগজের টুকরোগুলির দিকে লোভাতুর নজর ফেলতে পারে ? জেলের জন্যেই তো লোভের জন্ম হয়। পুলিসের লাল পাগড়ি দেখলেই মানুষের হাত অন্যের মাথায় বাড়ি মারার জন্যে নিসপিস করে। গান্ধীজী পাশ্চাত্যের নৈরাজ্যবাদীদের মতো মনে করেন, মানব সমাজের জন্যে কোনো আইন বা গভর্নমেণ্টের প্রয়োজন নেই।

গান্ধীবাদ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এবং ব্রহ্মচর্যের ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছে। গান্ধীজীর আশ্রমে এর জন্যে কঠিন থেকে কঠিনতর আইনও প্রস্তুত করা হয়েছে আর বোধহয় ঐ আশ্রমেই এই নীতিকে সবচেয়ে বেশি নস্যাৎ করা হয়েছে। একবার অসফল হওয়ায়, আবার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। অসংখ্যবার ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এই মতাদর্শকে সংশোধন করার কোনো আবশ্যকতা অনুভব করা হয়নি। একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষ, যিনি সবদিক থেকেই তাঁর বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছেন, তিনি যদি কঠোর ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালনে সামান্য এদিক-ওদিক করে ফেলেন তাহলে তাঁর প্রতারণার খবর সারা ভারতবর্ষের খবরের কাগজে প্রকাশ করে দেয়া হয়। আর ঠিক তাঁরই পাশের কোনো রাঘব বোয়াল যদি হাজার বার ঐ নিয়মকে অবহেলা করে, না মানে তার জন্যে কোনো কঠোর পন্থা অবলম্বন করা হয় না। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি-প্রতিরোধ করার জন্যে গান্ধীবাদের সবচেয়ে সহজ—সবচেয়ে সরল পথ হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। বিবাহিত পতিপত্নী সহবাস করবে না। কারণ, সন্তান-নিরোধের প্রচেষ্টা গান্ধীবাদের কাছে ক্ষমাহীন অপরাধ। গান্ধীবাদ প্রকাশ্যে ব্যভিচারের প্রচার করে। ব্রহ্মচর্য মানুষের কাছে স্বাভাবিক বস্তু আর স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ সম্পূর্ণ কৃত্রিম জিনিস। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা—যা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে সামনে আসছে, তার জন্যে গান্ধীবাদ এই সমাধান ভাবছে। এ এমন এক উপায়, যে-উপায়কে পালন করে, এমন দশ-বারো জনকেও গান্ধীজীর অনুগামীদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আর এই হাতিয়ারকে

অবলম্বন করে প্রতি দশ বছরে তিন কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে রোধ করার জন্যে বীমা করা হচ্ছে। মোদ্দা কথা, গান্ধীবাদের সবচেয়ে অটল বিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বর-ভক্তি। তিনি মনে করেন, যে-সমস্যা মানুষের পক্ষে সমাধান করা অসম্ভব —ঈশ্বরের কাছে তা একান্তই তুচ্ছ। তিনি সর্বশক্তিমান; মুহূর্তের মধ্যে তিনি অনেক বিরাট সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। আচ্ছা, কি এর প্রমাণ! এই প্রমাণের জন্যে আমাদের বিরাট আকারে ভূমিকম্প, প্লেগ বা ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

কোনো সমস্যাকেই স্পষ্টভাবে না দেখা ও চিন্তা করা, কঠিন সমস্যাকে অদৃশ্য, অপ্রমাণিত সাধনার ওপর ছেড়ে দেওয়া—ব্যস, এই হচ্ছে গান্ধীবাদের আসল রূপ।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে মীমাংসাহীন একটা প্রশ্ন বলে মনে করা হয়। কিন্তু তার কারণগুলির ওপর যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখব, এই বিভেদের কোনো শক্ত বনিয়াদ নেই। অর্থনৈতিক প্রশ্নই কোনো বিভেদকে মজবুত করতে পারে, অথচ এই সমস্যার গভীরে তেমন অর্থনৈতিক কারণও অনুপস্থিত। এই সামগ্রিক লড়াই-ঝগড়া সৃষ্টি করেছে মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর মানুষরা। বরং বলা যায়, উচ্চশ্রেণীর রাজা-নবাবরা এ-সব তৈরি করেছে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সঙ্গে এদের জড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্রেফ সাধারণ মানুষকে নিজেদের জালের মধ্যে ফাঁসিয়ে রাখা। আপনি সামন্ততন্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন মহারাজা নবাব রায়বাহাদুর খাঁ বাহাদুর—এরা সবাই সহোদর ভাইয়ের মতো বসবাস করছে। আসলে তাদের নিজেদের মধ্যে সে রকমের কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই, আর হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া-ঝাঁটিও তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করে না। এই লড়াই দাঙ্গায় প্রাণ দেয় এবং জেলে যায় সাধারণ গরিব মানুষ। জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ধনী মানুষরা কাজের মধ্যে এই করে, গরিব হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে, আর তারা যখন এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তখন তারা তালি বাজায়, ফয়দা লোটে। এই সমস্যার মূল নিহিত আছে কৃষক এবং শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে জ্ঞানের যে অভাব, তার মধ্যে। ধনিক শ্রেণীর পা-চাটারা বেহেশত এবং স্বর্গ সম্পর্কে তাদের মধ্যে লোভ এবং আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে এইসব গরিবদের ইহ-জীবনকে দুঃখময় এবং নারকীয় করে তুলছে। যদি তারা উপলব্ধি করে, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—সমস্ত গরিব মানুষের সমস্যা এক ও অভিন্ন এবং গরিবদের জানমানের বিনিময়েই তারা মুনাফা লুটছে; বেগারি খাটানো এবং বে-আইনীভাবে কর উশুল করা, তা-ও করা হয় গরিবদের কাছ থেকেই। আজ যদি জমিদারি প্রথা উঠে যায়, তাহলে কী হিন্দু, কী মুসলমান—সব গরিব মানুষই লাভবান হবে। শিক্ষাকে যদি বাধ্যতামূলক করা যায়, তাহলে দু'সম্প্রদায়ের গরিব শিশুরাই উপকৃত হবে। যদি দেশে নতুন সমাজ এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা যায়, তাতে সবচেয়ে লাভবান হবে গরিবরাই। যদি তারা এ-সব ব্যাপার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে তারা অনুভব করতে পারবে, এক হাজারের মধ্যে ন'শো নিরানব্বই জন মানুষই হিন্দু-মুসলমানের লড়াই-দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই লড়াই-দাঙ্গার কারণ, বিদেশী-প্রভুদের স্বার্থ, ধনিক শ্রেণীর লোলুপতা, আর অল্পসংখ্যক শিক্ষিত মানুষের চাকরি এবং মাতব্বরির দুর্দম বাসনা। সাধারণ মানুষের এই লড়াই-দাঙ্গায় ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হয় না। প্রয়োজন

হচ্ছে, এই ন'শো নিরানব্বই জন মানুষকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা। সাম্যবাদী এবং কৃষক নেতাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উচিত, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামান্যতম কোনো বিভেদ নেই, যা জমিদাররা দেখাতে চায়। বরং জমিদাররাই জনসাধারণের সামনে মিথ্যে অভিনয় করে—যাতে বাইরে থেকে তাদের অভ্যন্তরের মতবিরোধ বোঝা না যায়। কিন্তু সাম্যবাদীরা আর কিছু পারুক বা না পারুক, তারা যে হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়, তা তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। সমস্ত সাম্যবাদী কর্মীদের উচিত নিজেদের এক একটি উদাহরণ হিসেবে মানুষের কাছে হাজির করা। একসঙ্গে ওঠা-বসা—খাওয়া-দাওয়া প্রকাশ্যেই করা উচিত। পারস্পরিক চিন্তা-ভাবনা, ছেলেবেলা থেকে লালিত-পালিত হয়ে আসা সামাজিক সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে বিনা দ্বিধায় খোলা মনে তর্ক-বিতর্ক করা উচিত। ধর্মীয় হোক, বা সামাজিক, সাংস্কৃতিক হোক, বা রাজনৈতিক—প্রতিটি বিষয়বস্তুর প্রতিটি দিক নিয়ে নির্ভীকভাবে আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন। এ-কথা ভাবলে চলবে না যে, এ-ধরনের আলাপ-আলোচনা করলে হয়তো কেউ আঘাত পেতে পারে। স্বাধীনতা ছাড়া সাম্যবাদীদের কাছে আর কোনো বড় প্রশ্ন নেই—অন্য কোনো আবেগ প্রবণতার স্থান নেই।

আমরা জানি সাম্যবাদীরাও হিন্দু এবং মুসলমান পিতা-মাতার সন্তান। আর ছেলেবেলায় বাবা-মা'র সংস্কারের প্রভাব তার সন্তান-সন্ততিদের ওপর পড়বেই। এই প্রভাব তখনই দূর হতে পারে, যখন সামাজিক বন্ধন ভাঙার জন্যে আমরা সাহসের সঙ্গে চেষ্টা করব, এবং পরস্পর পরস্পরের কোমল থেকে কোমলতর ভাবনা—মননগুলিকে প্রকাশ্যে আঘাত করার জন্যে পিছপা হব না। সাম্যবাদীদের সর্বাগ্রে এই নিয়ম চালু করা উচিত, যারা সাম্যবাদী হবে, তারা হিন্দু-মুসলমান, ছুৎ-অচ্ছুৎ—যে-ই হোক না কেন তাদের একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতে হবে। তাদের এ-কথা ভাবলে চলবে না, সাধারণ মানুষ কী বলবে। যে কোনো ধরনের সামাজিক বিপ্লবে সামিল মানুষকে কিছুটা তিক্ত কথা সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। মানুষ জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠাকে বিরাট হিম্মত মনে করে। সমাজের গোঁড়ামিকে ভেঙে তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠার চেয়েও অনেক বেশি সাহসের কাজ। সাম্যবাদ এক নতুন বিশ্ব, এক নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে চায়। আর সেজন্যে তাকে সব ধরনের আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি আপনি বিয়ে-শাদি নিজের জাতপাতের গণ্ডীর মধ্যেই করতে চান, যদি আপনি শির-মুণ্ডন এবং উপনয়ন নিজের জাতির রেওয়াজ অনুযায়ী করতে চান আর স্বপাক খেতে চান, তাহলে আপনার মতো সাম্যবাদী সাম্যবাদের ক্ষতি সাধনই করবে। কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তর যেখানে আছে, যা যেখানে সাম্যবাদীরা সঙ্ঘ

(কমিউন) করে একসঙ্গে থাকে, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক পৃথক রান্নাঘর বা হাঁড়ি থাকা উচিত নয়। সবার খাবার এক জায়গায় তৈরি হবে, এবং যে ইচ্ছে সে রান্না করবে। আর সবারই একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করা উচিত। আমাদের সাম্যবাদী কর্মীরা হয়তো মনে করতে পারেন, এতে সাধারণ মানুষ, যাদের মধ্যে তাঁরা কাজ করতে চান তাঁরা ক্ষুব্ধ হবেন। সে প্রশ্ন উঠলে আপনাকে বোঝাতে হবে, গোঁড়ামিকে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলাই সাম্যবাদীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। জনসাধারণ তার সত্যিকার হিত সম্পর্কে উপলব্ধির শক্তি রাখে। যদি তাদের ঠিকভাবে বোঝানো যায়, তারা বুঝবে। এখানে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি: বহুদিন আগে একটি পরিচিত গ্রামে আমাকে যেতে হয়েছিল। সবাই আগ্রহ প্রকাশ করায়, আমি তাদের সাধারণ রুশ জনতার অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলি, কীভাবে সেখানকার আল-দেয়া ছোট ছোট ক্ষেতগুলির আল ভেঙে দিয়ে মাইলের পর মাইল দীর্ঘ খামার করা হয়েছে। সেখানে ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়ায় জোতা লাঙলের পরিবর্তে একহাত গভীর মাটি খুড়তে পারে এমন সাত-সাতটা ফলাযুক্ত পঞ্চাশটি ট্রাক্টর একসঙ্গে মাঠে কাজ করতে নামে। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিকরা ট্রাক্টরে বসে ঝাণ্ডা উড়িয়ে এবং আনন্দ করতে করতে তাদের সমবায়-ক্ষেতে যায়। হাওয়াই জাহাজে কীভাবে আকাশ থেকে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ক্ষেতে বীজ বপন করে, মেশিন কীভাবে ফসল কাটে এবং ফসল ঝাড়াই-মাড়াই করে। কীভাবে খাওয়ার সময়ে শয়ে শয়ে কৃষকরা কাজ থামিয়ে একজায়গায় সমবেত হয়ে খাওয়া-দাওয়া করে। সেই সময়ে তারা রেডিও চালিয়ে গান শোনে। কীভাবে একজন আর একজনের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে খেতে হাল দেয়, বীজ বোনে, আর ফসল উৎপাদন করে। একটি গ্রাম পিছিয়ে পড়লে অন্য গ্রামের মানুষ জোট বেধে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আসে এবং তাদের লজ্জায় ফেলে দেয়। কীভাবে গ্রামের ছোট ছোট ঝুপড়িগুলি ভেঙে প্রশস্ত রাস্তার ধারে কৃষকরা পাকা বাড়ি তৈরি করছে। বাড়িগুলিতে জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো এবং নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যও পৌঁছে যাচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে একটি করে স্কুল, হাসপাতাল ও সিনেমা হল তৈরি করেছে। প্রতিটি গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিকরা তাদের গ্রন্থাগার ক্লাব এবং নাট্যশালায় অংশ গ্রহণ করে। সেখানকার মানুষ দিনে মাত্র ছ-সাতঘণ্টা কাজ করে, আর বাকি সময় সংস্কৃতিমান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্যে সমস্ত উপকরণ সহজেই পেয়ে যায়। সেখানে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং প্রতিপালনের বেশিরভাগ দায়িত্ব সাম্যবাদী সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। পিতার না আছে ছেলে-মেয়ের বিয়ে-থা দেয়ার চিন্তা, না আছে তাদের জন্যে কিছু সম্পত্তি রেখে যাওয়ার চিন্তা। যদি কেউ বৃদ্ধ হয়, বা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার যাবতীয়

ব্যয়ভার অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে সরকার নিজের হাতে তুলে নেয়। সেখানকার মানুষের মাথায় যে অজস্র দুশ্চিন্তা ছিল, তার সামান্যতমও আর নেই। তাদের সঙ্ঘে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চামার সবাই একসঙ্গে আছে। তাদের প্রত্যেকের চোখে-মুখে প্রসন্নতা—আনন্দ দেখেছি। আমি তাদের এ-ও বললাম, কিন্তু রাশিয়াতে অনেক কিছু খারাপ জিনিসও আছে, যেমন, সেখানে ঘুরঘু তেওয়ারির মেয়ের সঙ্গে মংরু চামারের ছেলের বিয়ে প্রকাশ্যে—কোনো রাখঢাক না করে দেয়া হয়। আর এ-ধরনের বিয়েতে কেউ কোনো আপত্তি করে না। সেখানে একত্রে খাওয়া-দাওয়ায় জাতপাতের কোনো সমস্যা ওঠে না। মংরু চামার যদি ভালো রান্না করতে পারে, তাহলে রান্না সে-ই করবে। আর গ্রামের ব্রাহ্মণ রাজপুত—সবাইকে একসঙ্গে বসে খানাপিনা করতে হবে। সেখানকার উঁচু জাতির কেউ যদি এ নিয়ে আপত্তি জানায় তাহলে তাকে দেশ থেকে বের করেও দিতে পারে। ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্পর্কে সেখানে মানুষকে বিরোধী মনোভাবাপন্ন করে তোলা হয়েছে। হাজার হাজার গীর্জা এবং মসজিদ অনেক বছর ধরে মেরামতি করা হচ্ছে না। সে-সব গীর্জা বা মসজিদের ছাতের কড়ি-বরগা নিয়ে এসে তারা আগুন পোয়াচ্ছে। জীর্ণশীর্ণ দেয়াল এবং ছাতগুলি ভেঙে পড়ছে। পাদরি এবং মোল্লাদের পেশা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রানী মহারানীদের এখন আর পঞ্চাশটা করে পরিচারিকা নেই। তাদের নিজেদের হাতে এখন স্নান করতে হয়, শুধু তাই নয়, পেটের খিদে নিবারণের জন্যে খেতে কাজ করতে হয়, মাটি বইতে হয়—সর ধরনের পরিশ্রম করতে হয়। যাদের হাত একসময় মাখনের মতো মোলায়েম ছিল, সেই হাত এখন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছে—তাতে কড়া পড়েছে। সাধুসন্তের নাম সেখানে কেউ করে না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সেখানে জাতপাতের কথা কেউ-ই ভাবে-টাবে না। পেটের খিদে এবং দু'-চারদিনের জীবনের জন্যে কি আপনি এ-ধরনের অধর্ম পছন্দ করবেন? আমি ভেবেছিলাম, আমার ভাষণের শেষ অংশটুকু শুনে মানুষ ক্ষেপে উঠবে। কিন্তু আমি তাদের বলতে শুনেছি, এতে এমন কী হয়েছে, মানুষের মতো সুখের জীবন তো কাটাতে পারব, কোনোরকম চিন্তা-ভাবনা থাকবে না—মন তো দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকবে। অনেকেই বলল, আমাদের এখানে এ-সব কবে হবে? আমরা কি আমাদের জীবনে এ-সব দেখে যেতে পারব?

সাম্যবাদীদের নির্ভীকভাবে তাদের চিন্তা-ভাবনা জনসাধারণের সামনে রাখা উচিত। আর সে-অনুযায়ী কাজ করতে হবে। হয়তো কিছুদিন পর্যন্ত আপনার ভাবনা-চিন্তা মানুষ উপলব্ধি করতে পরেবে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার আসল উদ্দেশ্যের সঙ্গে গরিব হিন্দু-মুসলমান—সবাই একমত হবে।

গোঁড়ামি অন্ধবিশ্বাস—মানুষ এ-জন্যই আঁকড়ে থাকে, কারণ এ-সব গোঁড়ামিকে ভেঙে ফেলার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত তাদের সামনে নেই। জনসাধারণের মধ্যে জোর প্রচারকাজ চালানো উচিত—ধর্ম এবং ঈশ্বর হচ্ছে গরিব মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন। মৃত্যুর পরে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে এ-জন্মকে তারা নরক করে তোলে। বিভিন্ন ঋতু এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন উৎসবে সাম্যবাদীদের শামিল হওয়া দরকার। মানুষকেও এ-সব উৎসবের দিকে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু যে-সব উৎসবের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আছে, সে-সব উৎসব থেকে সাম্যবাদীদের নিজেদের সরিয়ে রাখা উচিত। আমাদের জন্মাষ্টমি এবং মিলাদশরীফ, নবরাত্রি এবং ঈদ ইত্যাদি উৎসবের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। তাজিয়া এবং রাম-লীলা—দু'-ই আমাদের কাছে ত্যাজ্য। হিন্দুদের গোরক্ষা সবচেয়ে বড় মূর্খতা এবং ক্ষতিকর ব্যাপার। তাদের পূর্বপুরুষরা আজ থেকে ষোলোশো বছর পূর্বে গরুর মাংস খেত। অন্যকেও খাওয়াত। এই সব ধূর্ত পুরোহিতদের পূর্ব-পুরুষরা ছ'মাসের বাছুর জবাই করে অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করত, আর আজ তারাই গরুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এ-ব্যাপারে আমাদের অভিমত সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। গরুর মতো অন্যান্য জন্তু-জানোয়াররাও আমাদের কাছে সমতুল্য। হিন্দু কৃষক-শ্রমিকদের বোঝাতে হবে, গোরক্ষা বিষয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের কি ভূমিকা ছিল? খোদার নামে কোরবানি করাও বোকামি—বিশেষ করে যে খোদা গরিবদের বড় শত্রু।

হিন্দুরা যখন তাদের কল্পনাপ্রসূত দেবদেবীদের উদ্দেশে ছাগল-শুয়োর বলি দেয়, তখন তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যখন মুসলমানরা সেই একই মূর্খতার পুনরাবৃত্তি করে, তখন তারা লাঠিসোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়—কী অদ্ভুত ব্যাপার! গোকশী এবং রামলীলা, তাজিয়া এবং বাদ্য—এ-সব ঝগড়া-ঝাঁটি বড়লোকদের কাজে লাগে। গরিবদের মধ্যে এ-সব নিয়ে তারা ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। একজনকে অন্যের শত্রু করে তোলে, তাদের বোকা বানায়। ধর্ম এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় চিত্তে প্রচার করা দরকার। কৃষক এবং শ্রমিকরা তাদের জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে প্রতিদিন এত গভীরভাবে অনুভব করে যে তাদের বোঝালে তারা ধর্মের এই ছল চাতুরীকে খুব সহজেই বুঝবে। একবার যদি এই উপলব্ধি—এইবোধ আমরা মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে পারি, তাহলে শ্রমিক এবং কৃষকের মিলিত শক্তি বিপ্লবের জন্যে উঠে দাঁড়াবে।

উর্দু-হিন্দি, ধুতি-পাজামা, লাল-সাদা টুপি—এ-সবকিছুই ধর্ম সৃষ্টি করেছে। কোনো জিনিস বা কোনো প্রথা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে বলে সাম্যবাদীরা তা গ্রহণ করে নিতে পারেন না। যদি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে আমরা মানুষের অনেক বেশি অজ্ঞতা ও বেকুবির পরিচয় পাব। প্রতিটি বিষয় নিয়ে আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে বিচার বিবেচনা করতে হবে।

আমরা কোনো পুথির কথা, বা কোনো বড় মাপের মানুষের কথা যাচাই না করে গ্রহণ করব না। তাহলেই আমরা নিজেরা নিজেদের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাব।

সে-সময়ের জন্যে আমাদের উন্মুখ হতে হবে, যে-সময় আমাদের দেশ থেকে জাতপাতের ভাবনা অবলুপ্ত হয়ে যাবে, ছোঁয়াছুঁয়ি লোপ পাবে এবং বেদ অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হবে। খাওয়া-দাওয়া, বেশ-ভূষা, ভাষা-ভাবভাবনা এক হয়ে যাবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন

শিক্ষা প্রণালীর ধরন এমন হওয়া উচিত, যা কোনো রাষ্ট্রের মানসিক এবং আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করে। ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে না, বরং তা আমাদের বিরাট ক্ষতি করে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে সর্বদা অপারগ করে দেয়। আমার বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, আমাদের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ। বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্য—যে-সব বিষয়বস্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ানো হয়, তা যে কোনো সভ্যদেশের জন্যেই প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন এক ত্রুটি আছে, যা আমাদের শিক্ষিত মানুষদের শারীরিক শ্রমে বিমুখ করে তোলে। শিক্ষিতরা শারীরিক শ্রম করাকে অসম্মানজনক মনে করে। আমাদের সমাজে শ্রম-বিমুখ এবং আলসে মানুষকে আমরা উপাসনা করি। অর্থাৎ আমরা এমন শিক্ষিত জনকে চাই, যে সমস্ত রকমের কায়িক শ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখে, এবং নিজের ছোট-খাটো—টুকি-টাকি ব্যক্তিগত কাজের জন্যে চাকরের ওপর নির্ভরশীল। এই অভ্যাস আমাদের দেশের শাসকশ্রেণী নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কায়েম করেছিল। আমাদের কালো এবং সাদা নবাব বাদশাদের উদাহরণ শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে আদর্শস্বরূপ। আর আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং তার ভবিষ্যতের দায়-দায়িত্বও তাদের ওপর ন্যস্ত।

শারীরিক শ্রম—এ-ব্যাপারে প্রথমে আমাদের শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর সংশোধন করা দরকার, অর্থাৎ শারীরিক শ্রমের গুরুত্ব, সে সম্পর্কে সচেতনতা আনা প্রয়োজন। পাঠক্রমের আবশ্যিক বিষয়গুলির অন্যতম হবে শারীরিক শ্রম, প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শারীরিক শ্রমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, অন্যথায় সে অসফল বলে গণ্য হবে।

প্রত্যেকেই শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে। সুতরাং শিক্ষা লাভের জন্যে শারীরিক শ্রম যে অনিবার্য, এই বোধ থেকেই শারীরিক শ্রম করতে বাধ্য হবে। শারীরিক শ্রম থেকে কাউকেই রেহাই দেয়া উচিত নয়, যদি কেউ শারীরিক প্রতিবন্ধী থাকে তার কথা পৃথক। মাটি খোঁড়া, ভার বহন—এই ধরনের শারীরিক শ্রম থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদের বয়স অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণীতে প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা শারীরিক শ্রম করা দরকার। শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকদের এ-জন্যে আনন্দিত হওয়া উচিত যে, ছাত্ররা নিয়মিত শারীরিক শ্রম করে এবং করতে পারে বলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। শিক্ষক এবং ছাত্ররা

পরীক্ষকদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। কারণ প্রতিদিন অভ্যাস না করলে, আধ ঘণ্টা পর্যন্ত মাটি কাটা খুব কঠিন কাজ। এমন অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন, যাঁরা বসে বসে দিন কাটান, কৃষিকাজ বা অন্য ধরনের শারীরিক শ্রম করতে অক্ষম, কারণ তাঁরা তাঁদের সমগ্র ছাত্র জীবনে কঠিন শারীরিক শ্রম থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থেকেছেন। সাপ্তাহিক শারীরিক শ্রম ছাড়াও মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজে প্রতিবছর একমাস পরিশ্রম করার জন্যে ক্যাম্প-জীবন আছে। এ ধরনের ক্যাম্প-জীবন থেকে ছাত্ররা প্রচুর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। হিটলারের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিতে ছাত্রদের জন্যে শারীরিক শ্রমের ব্যবস্থা করা হয়। আর এ-ধরনের ক্যাম্প তারা শ্রমিকদের জন্যেও তৈরি করে। ছাত্র এবং শ্রমিকরা এ-ধরনের ক্যাম্পে একই রকম জীবন-যাপন করে, তারা পরস্পরের চিন্তা-ভাবনা উপলব্ধি করতে পারে। নিঃসন্দেহে এ-সব খরচ-খরচা সরকারই বহন করে, আর এই শ্রম দিয়ে রাস্তা বা জনসারারণের প্রয়োজনীয় নানা ধরনের কাজ করা যেতে পারে। আমাদের ভালো রাস্তাঘাট নেই, তাছাড়া খাল এবং বাঁধেরও প্রয়োজন। যদি আমরা জার্মানির পথ অনুসরণ করি, তবে আমরা আনায়াসে ক্যাম্প-জীবনের ব্যয় বহনের ব্যবস্থা করতে পারব এবং এই শারীরিক শ্রম অনেক কাজে লাগবে।

কৃষি-শিক্ষা—আমরা জানি, এ-দেশে চাষ-বাসের পদ্ধতি এবং অবস্থা অত্যন্ত প্রাচীন। আমাদের কিছু কৃষি বিদ্যালয় আছে, সে-সব বিদ্যালয়ে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের কৃষিতে কোনোরকম বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এজন্যে আমরা কৃষকদের রক্ষণশীলতাকে দোষ দিয়ে থাকি। কৃষকসমাজে রক্ষণশীলতা অবশ্যই আছে আর এ ধরনের কৃষক-চরিত্র পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। কিন্তু এ তো খুব সাধারণ ব্যাপার, কৃষকরা তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা অবশ্যই বোঝে। উত্তর বিহারের আখের চাষের কথা আমার মনে আছে, কিন্তু চিনির কল স্থাপনের পর থেকে যে পরিবর্তন হয় তা বিশেষভাবে অনুধাবন করি। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষকরা অন্য ফসল উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে আখের চাষ শুরু করে দেয়। আমাদের পুসা কলেজ নতুন গবেষণার কাজ চালানোর সহায়ক হতে পারে। কিন্তু কৃষি-কলেজে কৃষি কাজ করার জন্যে যে খরচ পড়ে, তা এত বেশি যে, বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ইউরোপ এবং আমেরিকায় যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে, তা আমরা আমাদের দেশে চালু করতে পারব না। কারণ আমাদের কৃষকদের কাছে না আছে অত জমি, না তেমন মূলধন। তাই আমাদের আধুনিক কৃষি-বিদ্যা কৃষি-স্কুল থেকে আহরণ করাই উচিত হবে। কৃষি-কলেজে পড়াশোনা করার জন্যে আমাদের এখানে ছাত্রদের অন্তত পক্ষে এণ্ট্রান্স পাশ করা ন্যূনতম যোগ্যতা করা হয়েছে। আর তাই কৃষি-কলেজ থেকে পাশ করার পর, ছাত্ররা চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরে। এমন কোনো ব্যবস্থা

নেই যে, অল্প দিনের মধ্যে কৃষকদের কিছু প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া যায়, বা যারা শিক্ষালাভ করতে চায়, কম লেখাপড়া জানলেও তাদের কৃষি-স্কুলে প্রবেশের অধিকার দেয়া যায়। প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা এমন করা উচিত যাতে ছ'বছরের পাঠক্রম সমাপ্ত করে ছাত্ররা কৃষি-স্কুলে ভর্তি হতে পারে।

এই প্রণালীর মধ্যে নতুনত্ব আনার জন্যে আমাদের খরচ-খরচার ওপর দৃষ্টি দেয়া দরকার। যদি এর খরচ অত্যধিক হয়, তবে কৃষকরা এর প্রতি আকৃষ্ট হবে না। আমি কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা ব্যবস্থার নিন্দা করছি না। বলছি, ব্যবহারিক বা প্রয়োগগত শিক্ষার মূল্য অনেক বড়। আর এই অভিপ্রায় থেকেই বলছি, আমাদের প্রতিটি জেলায় এক একটি করে কৃষি-স্কুল দরকার, যে স্কুলগুলিতে থাকবে চার বছরের পাঠক্রম। আর নিয়মিত ছাত্রদের ছাড়াও সাধারণ কৃষকদের জন্যেও থাকবে অল্পদিনের জন্যে বিশেষ বিষয়ের পাঠক্রম। নতুন প্রণালীর অন্বেষণ এই শিক্ষার প্রধান অংশ হবে। এ-শিক্ষা ব্যবস্থা তখনই উপযোগী হবে, যখন কৃষকরা সস্তায় এবং দৌড়ঝাঁপ না করে কৃষি যন্ত্রপাতি, সার এবং বীজ পাবে। সস্তায় কৃষি সাজ-সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য দেশী কারখানা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কিত শিক্ষা—প্রথম কথা হচ্ছে, সারা দেশই কলকারখানা—অর্থাৎ শিল্প-উদ্যোগের দিক থেকে পিছিয়ে আছে। আর বিহার তো আরও পিছিয়ে। এই প্রদেশের সরকার যেমন শিল্পের ব্যাপারে এতটুকু নজর দিচ্ছে না, তেমনি সাধারণ মানুষও এ-ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন। ধানবাদে মাইনিং স্কুল আছে। যদি ছাত্রদের তালিকা দেখা যায়, তবে দেখব, অধিকাংশই বিহারী নয়। ভারবর্ষের মতো এমন ঘন বসতিপূর্ণ দেশের মুক্তি কলকারখানার উন্নতির ওপরই নির্ভরশীল। প্রতিটি কমিশনে একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল থাকা দরকার, যার পাঠক্রম হবে চার বছরের। এ ধরনের টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে ভর্তি হওয়ার জন্যে ছাত্রদের মিডিল পাশ হতে হবে। এ-সব স্কুলের শিক্ষা স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী হওয়া দরকার। এখানে চীনা মাটির পাত্র, চামড়ার কাজ, ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, রেশমের কাজ, ব্যবহারিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং শিল্পের প্রয়োজনে রসায়ন শাস্ত্র—এ রকম নানা বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা—আর কাল বিলম্ব না করে ছেলে-মেয়েদের জন্যে বিনা খরচায় এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করে দেয়া দরকার। প্রয়োজনীয় টাকার জন্যে আমাদের চাঁদা তুলতে হবে এবং ধার নিতে হবে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা নাগরিকতার আবশ্যিক শর্ত। প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া সামাজিক অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে উন্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ছেলে এবং মেয়েদের জন্যে পৃথক পৃথক স্কুল থাকলে খরচ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ছ'

থেকে বারো বছর পর্যন্ত সহশিক্ষায় কেউ বিরোধিতা করবে না। ভাষা, ব্যাকরণ, অঙ্ক ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা ছাড়াও, আমাদের শারীরিক শ্রম শিক্ষাকেও শুরু করে দিতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু নৈতিক এবং জাতীয় শিক্ষা এমনভাবে দেয়া দরকার, যাতে তারা জাতীয়তা কী তা শিখতে পারে। ইউ. পি. এবং পাঞ্জাবে হাইস্কুলের পাঠক্রম প্রাইমারি স্তর ধরে দশ বছরের। বিহারে এগারো বছরের শিক্ষা ক্রমের কোনো প্রয়োজন নেই। ইংরেজি হবে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হবে। প্রাচীন ভাষার ওপর যেন জোর দেয়া না হয়। কিন্তু ছাত্রদের গণিত এবং বিজ্ঞান ছাড়াও অতিরিক্ত বিষয় পড়ার জন্যে উৎসাহিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা থেকে যেন আমরা বেশি বেশি করে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আমাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্যে বিজ্ঞানেরই অধ্যয়ন করা উচিত। কিন্তু ব্যবহারিক বা প্রয়োগগত বিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের বিশেষভাবে আহরণ করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে যে-কোনো রাষ্ট্রকে ছাত্রদের স্বার্থে বেশ কিছু টাকা ব্যয় করতে হয়। সেজন্যে বিজ্ঞানের ছাত্ররা স্নাতক হয়ে, যেন আইন পড়ে এ-টাকার অপব্যয় না করে। প্রফেসরদের নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। শিক্ষা সম্পর্কিত সংস্থায় জাতপাত বা শ্রেণী মনোভাবের প্রকাশ ঘটা খুবই ক্ষতিকারক। অনার্স এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে সে-সব অধ্যাপকদেরই পড়াতে দেয়া উচিত, যাঁরা নিজ নিজ বিষয়ে মৌলিক গবেষণার কাজ করেছেন। যদি কোনো অধ্যাপক কোনো মৌলিক রচনা গবেষণামূলক কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করে না থাকেন, তবে তাঁকে যেন সে-বিষয়ে ক্লাসে পড়ানোর অধিকার দেয়া না হয়। প্রাচীন-ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্যে ইংরেজি ভাষার ওপর নির্ভর করার কোনো প্রয়োজন নেই। পুরানো আদব-কায়দার মৌলবী এবং পণ্ডিতরা তাঁদের বিষয়ে যে কোনো এম. এ. ডিগ্রীধারীর চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ভালো পড়াতে পারেন। কাজেই ইংরেজির মাধ্যমে সংস্কৃত পড়ানোর কোনো অর্থ হয় না। আমি জানি, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত এবং মৌলবীরা নিজের বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী নন। কিন্তু অনার্স এবং পোস্ট গ্রাজুয়েটের প্রফেসরদের রিসার্চ স্কলার হওয়া উচিত। সমস্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চ্যান্সেলর হন ভাইসরয় বা গভর্নররা। অতীতে এ-ব্যবস্থার মধ্যে হয়তো কোনো উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এখন যখন নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, তাহলে আর পুরানো ব্যবস্থার কী প্রয়োজন? আমাদের এমন একজন বেতনভোগী চ্যান্সেলর রাখা দরকার, যাঁর মধ্যে অন্তত এতটুকু গুণ এবং ভব্যতা আছে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে

খুব সুচারুরূপে পরিচালনা করতে পারেন। বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় খুব খারাপ। অফিসারদের চোখে যে যোগ্য, তাকেই ভাইস-চ্যান্সেলর করে দেয়া হয়। আসলে ভাইস-চ্যান্সেলরের পদও এক ধরনের রাজভক্তির সম্মানসূচক পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ পদবী দেয়ার মতো। আর এ-কাজকে এমন সহজ কাজ বলে মনে করা হয় যে, দশ মিনিটের মধ্যে ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁর পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেন। কারণ অবৈতনিক ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁর পেশা থেকে তো সময়ই বের করতে পারেন না। আমরা ইচ্ছে করলে, প্রতিবেশী ইউ. পি.-র বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে এ-বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে পারি।

পিছিয়ে-পড়া জাতিগুলির শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা ব্যয় বহুল। পিছিয়ে থাকা শ্রেণী এই খরচ বহন করতে পারে না, কারণ তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। শিক্ষা-দীক্ষায় তারা ততদিন উন্নতি করতে পারবে না, যতদিন না সরকার তাদের মেধাবী ছাত্রদের সহযোগিতা করছে। আমি জানি, সরকারের কাছে এত টাকা পয়সা নেই যে, পিছিয়ে থাকা জাতিগুলির ছেলেমেয়েদের জন্যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু তাদের জন্যে আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে, যেন চিরদিন তারা সামাজিক অন্যায়-অবিচারে জর্জরিত ও পিষ্ট না হয়। এ ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই দৃষ্টিপাত করা দরকার। পিছিয়ে থাকা জাতিগুলির সমস্ত ছাত্র—যারা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা যেন উচ্চশিক্ষার জন্যে সরকারি বৃত্তি পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুমোদিত গ্রন্থসমূহ—যে-সব বই ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয় সেগুলি ব্যক্তিগত প্রকাশকদের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়। কী ধরনের ঘুষের ব্যবস্থা এইসব পুস্তক নির্বাচনে চলে, সে রহস্য উদ্ঘাটন করা খুবই কঠিন। প্রতিটি প্রকাশকেরই বিরাট দায়িত্ব আছে। সুতরাং যদি কোনো শিক্ষা-সংস্থায় নীতিহীনতা লক্ষ্য করা যায়, তবে কঠিন শাস্তি দিতে যেন পিছপা না হই। শিক্ষাবিভাগ একদল যোগ্য লেখককে উচিত পারিশ্রমিক দিয়ে রাখতে পারেন। যতগুলি বই প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্যে নির্বাচিত হবে, তা শিক্ষাবিভাগ প্রকাশ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় তার পাঠক্রমের সমস্ত বই-ই প্রকাশ করবে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র সেই বিশেষ বিষয়ের ওপর লেখা বই বাইরে থেকে কেনা যেতে পারে, যার লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন।

নিচে আমি সেইসব সংশোধনগুলির সারাংশ দিচ্ছি, যা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচলিত করা একান্ত আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষা—১. ছ'বছরের পাঠক্রম (৭ থেকে ১২ বছর বয়স্কদের জন্যে), ২. অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক, ৩. ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা, ৪. বাধ্যতামূলক শারীরিক শ্রম (মাটি কাটা, ভার বহন করা), ক. প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে তিন ঘণ্টা, খ. পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্যে প্রতি সপ্তাহে চার ঘণ্টা, ৫. পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্যে কিছু খেতখামারের কাজ এবং কিছু গৃহ বিজ্ঞানের পাঠ, ৬. সপ্তাহে দু'ঘণ্টা সামরিক কসরৎ, ৭. জাতীয় এবং নৈতিক শিক্ষা (ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে)।

মাধ্যমিক শিক্ষা (অ). হাই স্কুল—১. চার বছরের পাঠক্রম (১৩ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত), ২. বাধ্যতামূলক শারীরিক শ্রম (মাটি কাটা, ভার বহন করা), প্রতি সপ্তাহে ছ'ঘণ্টা মাতৃভাষা এবং দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক ভাষা ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ, ৩. বিকল্প হিসেবে একটি প্রাচীন ভাষা, ৪. অতিরিক্ত গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা, ৫. ক্যাম্প-জীবনে শ্রম (পয়সা না নিয়ে প্রতি বছরে এক মাস), ৬. প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ পিছিয়ে-থাকা শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য ছাত্র-বৃত্তি।

(আ). কৃষি-বিদ্যালয়—১. প্রতিটি জেলায় একটি করে, ২. প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের প্রবেশাধিকার, ৩. নিয়মিত ছাত্রদের জন্যে চার বছরের পাঠক্রম, বিশেষ শিক্ষার জন্যে ছ'মাস, ৪. খেতখামারের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক শিক্ষা, ৫. বাগিচার কাজ, রেশমের কাজ, মাখন তোলার কাজ, মুরগি পালনের কাজ, ৬. ক্যাম্প-জীবনের শ্রম (পারিশ্রমিক ছাড়া)—প্রতি বছর একমাস, ৭. শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা, ইংরেজি ঐচ্ছিক দ্বিতীয় ভাষা, ৮. সামরিক শিক্ষা প্রতি সপ্তাহে দু' ঘণ্টা, ৯. (অ-৬)-এর মতো ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা।

(ই). ব্যবহারিক—১. প্রতিটি কমিশনে একটি স্কুল, ২. চার বছরের পাঠক্রম, ৩. রেশম, সেলাই, ছুতোরের কাজ, চীনা মাটির পাত্র তৈরি, চামড়ার কাজ, কাঁচ এবং অন্যান্য দ্রব্যের কাজ, কাগজ তৈরি এবং ব্যবহারিক রাসায়নিক শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়।

(ঈ). গ্রামের পরিকল্পনা তৈরি ইত্যাদি—১. প্রবেশ—অষ্টম শ্রেণী পাশ করলে, ২. বাধ্যতামূলক শারীরিক শ্রম (মাটি কাটা, ভার বহন করা)—প্রতি সপ্তাহে ছ' ঘণ্টা, ৩. ক্যাম্প-জীবনে শ্রম (বিনা পারিশ্রমিকে) প্রতি বছর একমাস, ৪. সামরিক শিক্ষা,—সপ্তাহে দু'ঘণ্টা, ৫. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা ইংরেজি, ৬. (অ-৬)-এর মতো সমপর্যায়ে ছাত্র-বৃত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—১. ভবিষ্যতের উপযোগিতা অনুযায়ী বিষয়-গুলির বিভাগীয়করণ, ২. বাধ্যতামূলক শারীরিক শ্রম (মাটি কাটা, ভার বহন করা)—সপ্তাহে ছ'ঘণ্টা, ৩. ক্যাম্প-জীবনের শ্রম (বিনা পারিশ্রমিকে)—প্রতি বছর একমাস, ৪. রাইফেল চালনা এবং অন্যান্য সামরিক কসরৎ,—প্রতি সপ্তাহে দু'

ঘণ্টা, ৫. শিল্প এবং সমাজ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা, ৬. রাজনৈতিক চিন্তা এবং তা ব্যক্ত করার স্বাধীনতা, ৭. শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা, ইংরেজি দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক ভাষা, ৮. বিজ্ঞানের স্নাতক—যেন আইন না পড়ে, আর অন্যেও যেন এ-পেশায় গিয়ে জ্ঞানকে ব্যর্থ না করে, ৯. আবশ্যিক গুণাবলীসহ, বেতনভোগী চ্যান্সেলর নিয়োগ, ১০. প্রাচীন ভাষা অধ্যয়নের জন্যে প্রথম চার শ্রেণীর জন্যে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অধ্যাপকের প্রয়োজন নেই, ১১. যে-সব অধ্যাপকরা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ান, তাঁদের গবেষণামূলক প্রবন্ধে লেখার প্রয়োজন, ১২. অধ্যাপকদের নিযুক্তি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হোক, ১৩. পিছিয়ে-পড়া জাতি বা শ্রেণীর যারা ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা যেন ছাত্র-বৃত্তি পায়।

নব-নির্মাণ

সাম্যবাদীরা সমাজের অর্থনৈতিক নির্মাণ নতুনভাবে করতে চায়। আর সে কাজ রিপু করে বা জোড়াতালি দিয়ে হবে না। বরং বলা যায়, নতুন ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েই তা করতে হবে। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এত ভয়ঙ্কর যে, তাদের অনন্তকালের দিকে ইঙ্গিত করে কোনো লাভ নেই। আমাদের এখনি—এই মুহূর্তে কাজে নামতে হবে। গত নির্বাচনের সময় জনগণের সামনে যে কর্মসূচি রাখা হয়েছিল, সেই কর্মসূচিতে সাম্যবাদীরা যা চায়, সেই নতুন নির্মাণের কথা ততখানি ছিল না। কিন্তু দেখেছি, আমাদের নেতারা এই সামান্য কর্মসূচিকেও কার্যকরী না করে টালবাহনা করছেন। যাদের ভোট নিয়ে কংগ্রেসীরা ভোট যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন, সরকারের রাশ এখন যাঁদের হাতে তাঁরা এখন বলছেন, তাঁরা শুধু কৃষকদের প্রতিনিধিই নন, জমিদারের প্রতিও তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে। হয়তো তাঁরা জানেন না যে, কৃষকরাই তাঁদের বিজয়ী করেছে এবং ক্ষমতায় বসিয়েছে, আর এই কৃষকদের কাছেই তাঁদের আবার চার বছর বাদে এসে ভোট চাইতে হবে। হয়তো তাঁরা মনে করেন, কংগ্রেসের সংগঠন তাঁদের হাতের মুঠোয়। কৃষকদের বিপ্লবের গরম গরম বুলি ঝেড়ে, বর্তমানে কিছুটা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখিয়ে ভোলানো যেতে পারে। কৃষক নেতৃত্বকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কোনো রকম হৈ-চৈ করার সুযোগই তাঁরা দেবেন না। কেউ ট্যাঁফুঁ করলে 'শৃঙ্খলা ভঙ্গের' ভয় দেখাবেন। অ্যাসেম্বলি এবং কাউন্সিলে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের কিছু সুযোগ-সুবিধে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে দেবেন না। অসংখ্য প্রস্তাব এবং ভাষার মারপ্যাঁচে ভয় দেখিয়ে প্রতিটি কাজ কার্যকরী সমিতি এবং মন্ত্রীদের হাতে অর্পণ করে বস্তুত সব কিছুই নিজেদের হাতের মুঠোয় ধরে রাখবেন। এভাবে আমরা আবার চার বছর পরে সেই একই ঠাটবাট নিয়ে কৃষকদের সামনে হাজির হব, যেমনভাবে গত নির্বাচনের সময় হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁদের স্মরণে রাখা দরকার, কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট কোনো কাল্পনিক ব্যাপার নয়। বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী-গুলি থেকে ভারতবর্ষের কৃষকরা বঞ্চিত। তাদের দারিদ্র্যতার কোনো নজির নেই। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা, বিয়ে-থা, ঋণ-নজরানা, বেগারি—এ-রকম হাজার চিন্তায় তারা জর্জরিত, এগুলি তুষের আগুনের মতো তাদের বুকের মধ্যে ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে। মধুর বচনে আপনারা কৃষকদের ভোলাতে পারবেন না, আর কৃষক নেতৃত্বও এত সাদা-সিধে না। তাঁদের না আছে ব্যক্তি-গত স্বার্থ না আছে নাম ধামের প্রতি কোনো মোহ, তাই তাঁরা আপনাদের মিষ্টি

মধুর কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়বেন না। কৃষকরা যে প্রস্তাব এনেছে, সে প্রস্তাব দেখে আপনারা হেঁচকি তুলছেন। আমরা এ-কথা বলছি না, মন্ত্রীরা—যাঁদের অধিকাংশই জমিদার, তাঁরা তাঁদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে টালবাহনা করছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জমিদারদের সংগঠনের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, হয়তো আপনারা আপার কাউন্সিলের ভোটের জন্যে ভয় পাচ্ছেন যে, আপার কাউন্সিলে জমিদাররা সংখ্যাগরিষ্ঠ আর তাই আপনি আপস-রফা করতে চাইছেন। এর মধ্যে এমন অনেক ধরনের স্বার্থ জড়িত আছে, যার সঙ্গে সমঝোতা করে আপনারা কৃষকদের ঘোরতর শত্রু করে তুলবেন। ভাওলি, দানাবন্দী, সার্টিফিকেট এবং সেলামি ইত্যাদি নিয়ে কোনো রকম আপস-রফাই চলতে পারে না। এক কলমের খোঁচায় তা বাতিল করে দিতে হবে। যদি কাউন্সিল থেকে পাশ না হয়, তবে অন্য কোনো পথ আপনারা খুঁজে বের করুন। কৃষি থেকে আয়ের জন্যে আপনারা জমিদারদের ওপর যে কর বসাতে চান, সে ব্যাপারে নমনীয়তা দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে পারবেন না। পাঁচ হাজার টাকা যে-জমিদারির আয়, তাকে এই কর থেকে রেহাই দিতে পারেন, কারণ এই আয় থেকেই তাকে তার পরিবারের আট-দশজনকে ভরণপোষণ করতে হয়, আর তাদের জন্যে বছরে মাথাপিছু খরচ হয় আটশো থেকে হাজার টাকা। তবে যেখানে করের হার বেশি, সেখানে হার কমাতে হবে। প্রতিটি খেতের শ্রেণী-বিভাজন সার্ভেতে লেখা আছে সেই শ্রেণী-বিভাজন অনুযায়ী সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন খাজনার হার বেঁধে দিন। নির্ধারিত হার অনুযায়ী ছোট বড় সমস্ত জমিদারদের চলতে বাধ্য করুন। পাঁচ হাজার থেকে যাদের আয় বেশি, তাদের ওপর আয়কর বসানো দরকার। আর এক থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত যাদের আয়, তাদের ওপর যেন ৩০%-এর নিচে কর বসানো না হয়। পাঁচ থেকে দশ লাখ পর্যন্ত ৪০%, দশ থেকে কুড়ি লাখ পর্যন্ত ৫০% এবং কুড়ি লাখের ওপর যাদের আয়, তাদের কাছ থেকে কোনোভাবেই কম কর নেয়া উচিত নয়। আমাদের মন্ত্রীরা তিন-চার লাখ টাকার বেশি আয়কর আদায়ের প্রত্যাশী নন। দের কোটি টাকা আয় তো বিহারের মাত্র চার-পাঁচজন জমিদারের কাছ থেকেই হতে পারে। আর আশি লাখ টাকা তো বাদবাকী জমিদারদের কাছ থেকেই উশুল করতে পারেন। যদি আপনাদের মধ্যে দৃঢ়তার অভাব থাকে, হাত কাঁপে, তাহলে কৃষকদের স্পষ্টাস্পষ্টি কেন বলছেন না? কেন এ বাহনা করছেন যে, আপার চেম্বার দেখে ভয় পাচ্ছেন? অথচ এ-সব ব্যাপার নিয়ে আপনারা গভর্নরের সঙ্গে আগেই তর্কবিতর্ক করেছেন। জমিদার বা গভর্নর কাউকেই আপনাদের পরোয়া করা উচিত নয়। আপনার প্রস্তাব এবং বিলকে সাহসের সঙ্গে উথাপন করুন। যদি কাউন্সিল তা বাতিল করে দেন, তাহলে গভর্নর-কাউন্সিল এবং অ্যাসেম্বলি—দু'য়ের যুগ্ম বৈঠক ডাকতে বাধ্য করুন। তা যদি সম্ভব না হয়, তবে নতুন করে নির্বাচন

ডাকুন, আর সেই নির্বাচনে শুধু আয়করই নয়, জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির প্রস্তাব রাখুন। আবার কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়ে আসুন এবং সেই একই উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আপনার কর্মসূচী উপস্থিত করুন। জমিদার এবং কৃষকদের স্বার্থ এমন ভয়ানক পরস্পর বিরোধী যে, আপনি একান্তভাবে ঘরে ডেকে জমিদারদের সঙ্গে কথা বলে, বা অমুক 'স্যর', বা তমুক 'নারায়ণ সিংহ'কে চা-পার্টিতে আপ্যায়ন করে ফয়সালা করতে পারবেন না। সে-সময় আর বহু দূরে নেই, যখন কৃষকরা—যারা আপনার সত্যিকারের মালিক, তারা আপনাকে হুকুম দেবে—বৃহৎ জমিদার আর রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে দহরম-মহরম এবং চা-পান বন্ধ করুন। এমন একদিন ছিল, যখন কংগ্রেস তার চা-পার্টিতে সরকারি আমলাদের আমন্ত্রণ করতেন না। কী লজ্জার কথা আপনারা ভোট নেন কৃষকদের কাছ থেকে, অধিকার অর্জন করেন কৃষকদের ভোটের জোরে, আর বলেন, আমরা তো কোনো একপক্ষের সরকার নই। যদি আপনাদের বুকের পাটা থাকে, তবে জনসাধারণের সামনে প্রকাশ্যে সে-কথা বলুন। তার উত্তরে কৃষকরা বলবে—আপনি যদি জমিদার এবং কৃষকদের মধ্যস্থ হন, তাহলে আগেকার সরকারের মতো আপনারাও কৃষকদের দুশমন।

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, কাউন্সিলে হয়তো প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিতে চান না। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে আছেন, তাঁদেরই তাঁরা রাখতে চান। টালবাহানা করা হয়, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিলে ভোটারের সংখ্যা অধিক হয়ে যাবে, খরচ অনেক বৃদ্ধি পাবে, আর তা কার্যকরী করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এ-সব উক্তি করতে কংগ্রেসের মন্ত্রীদের লজ্জা পাওয়া উচিত। অথচ কত বছর ধরে এঁরাই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছেন। সম্প্রতি তাঁরা ভারতবর্ষে স্বদেশী-আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা (কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। অন্যকে কুপোকাত করার জন্যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের প্রস্তাব ঠিক, অথচ নিজেদের জন্যে তা ঠিক নয়, এ এক অদ্ভুত নীতি! আগেকার সরকার যখন সংসদ-সদস্যদের মনোনীত করে অ্যাসেম্বলিতে পাঠাত, তখন কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের হাজার রকম গালিগালাজ দিতেন। এখন তাঁদের ভয়, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নরমপন্থী কংগ্রেসীদের চেয়ে সাম্যবাদী এবং কৃষক প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়ে যায়। সেজন্যে তাঁরা মনোনীত সংসদ-সদস্যদের নিজেদের কুক্ষিগত করতে চান। এ সরাসরি বেইমানি—আদর্শকে হত্যা করা নয় তো, আর কি? পুরানো মন্ত্রীদের মতো আমাদের নতুন মন্ত্রীরাও যেন জাতপাত নিয়ে মাথা না ঘামান। হয়তো তাঁরা তাঁদের পেটোয়া, আত্মীয়-স্বজন, নাতি-নাতনীদের সদর দরজা দিয়ে না এনে, পেছনের খিড়কি

দরজা দিয়ে আনতে চাইছেন। তাঁদের কাজ কারবার দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের নেতারা মনে করেছেন, তাঁরা যা চাইছেন, তা তাঁরা বিনা ঝামেলায়—শান্তিপূর্ণ-ভাবে করবেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না, বারুদের স্তূপের ওপর তাঁরা বসে আছেন। একটা স্ফুলিঙ্গ এমন দাবানল সৃষ্টি করবে যে, তাঁদের আর কোনো পাত্তাই পাওয়া যাবে না। নির্বাচন দোর গোড়ায় এসে গিয়েছে কাজেই এই মুহূর্তে পুরানো নিয়ম পরিবর্তন করা যাবে না। এই টালবাহনার কথা শুনে গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে। কে আপনাকে বলেছে, এখনি নির্বাচন করুন? ভোটার তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে, তাতে কি হয়েছে, চুলোয় যাক ভোটার তালিকা। ছ'মাস বা এক বছর পরে নির্বাচন করুন। এখন যেমন মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড আছে তা তেমনি থাকুক। কিন্তু যখন ভোট করবেন, তখন যেন প্রাপ্তবয়স্করা ভোটাধিকার পায় এবং মনোনীত সংসদ-সদস্যদের কথা মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিন।

এখন ভোটারদের এমন একটা অবস্থা যে, দলিত জাতিগুলি এবং মুসলমানদের থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা খুব কঠিন কাজ। সেজন্যে যুক্ত নির্বাচনের সঙ্গে এ-দু'টি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সংখ্যা যেন অপরিবর্তিত থাকে, যাতে প্রগতি-বিরোধিরা অন্য কারো সঙ্গে জোট বেঁধে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে।

আমাদের দেশে নতুন অর্থনৈতিক-নির্মাণ কাজের আবশ্যকতা আছে। আর তার জন্যে যে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং ব্যাপক অধ্যয়নের প্রয়োজন, তা আমাদের কংগ্রেস নেতারা আবশ্যক মনে করেন না। কাজেই এই রকম পরিস্থিতিতে এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, তাঁরা সাহসে ভর করে এগিয়ে যাবেন। বর্তমান বাজেট থেকে ২৭ লাখ টাকা যে কোনো নির্মাণ কাজের জন্যে সরিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু, আমাদের না আছে কোনো যোজনা, না আছে কোনো নতুন চিন্তা-ভাবনা। কাজেই ২৭ লাখ টাকা আলাদা করে রাখার কোনো প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু নতুন নির্মাণ কাজের প্রকল্প গ্রহণ করলে দু-এক কোটি টাকা নয়, দশ-বিশ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হবে। আগেকার মন্ত্রীদের থেকে নতুন মন্ত্রীরা কম টাকা মাইনে নিচ্ছেন, এই ত্যাগের খবর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কংগ্রেস সারা দুনিয়াকে জানাচ্ছে। অর্থ-বিভাগ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা এবং নতুন-নির্মাণ কাজ, স্বাস্থ্য এবং আবগারি—এরকম বিরাট বিরাট দপ্তর আছে। দু'টি করে দপ্তরের দায়িত্ব এক-একজন মন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত হওয়ায়, ফাইলে সই করার পর এসব মন্ত্রীদের এমন সময় থাকে না যে নিজেদের দপ্তর নিয়ে নতুনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করবেন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নতুন চিন্তা-ভাবনা সমৃদ্ধ বই পড়বেন। এই কারণে, তাঁরা সমস্ত চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব তাঁদের দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিকদের ওপর ছেড়ে দেন। ফলে এই আধিকারিকরা

যে সিদ্ধান্ত নেন এবং যা বলেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী তা-ই মাথা পেতে গ্রহণ করেন। এখন থেকেই লক্ষ্য করছি, জনসাধারণের কোনো দুঃখ-দুর্দশার কথা মন্ত্রীদের কাছে পেশ করলে, তিনি তাঁর অধস্তন আধিকারিককে তাঁর উকিল হিসেবে জনসাধারণের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। এইসব উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অবশ্যই কিছু লেখাপড়া আছে কিন্তু তাঁদের জ্ঞান কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। নতুন নির্মাণ কাজ হচ্ছে মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত, নিছক কেতাবি কথা নয়। বই থেকে তত্ত্ব অনুধাবন করা যায় ঠিকই, কিন্তু এই তত্ত্ব উঠে আসে মাটি থেকে। আর এইসব তত্ত্ব এসেছে অন্য দেশ, অন্য পরিবেশ এবং অন্য সমাজ থেকে। কিন্তু এই তত্ত্ব বা মতাদর্শ অর্থহীন, যদি সেই তত্ত্বকে আমাদের মাটি, দেশ, পরিবেশ এবং সমাজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে নতুনভাবে রূপান্তরিত করা না যায়। কি প্রয়োজন আছে চারজন মন্ত্রীর? এসব দেখানোর জন্যে কি, আমাদের মন্ত্রীরা দু' হাজার টাকায় কাজ করেন? যদি চার হাজার টাকা ব্যয় করে কয়েক গুণ বেশি কাজ পাওয়া যায় তাহলে দু'হাজার টাকা কম দিয়ে আমাদের কি লাভ? আমরা কেন আটজন মন্ত্রী রাখছি না? এক-একটি বিভাগে এক-একজন মন্ত্রী থাকলে তাতে তাঁদের ফাইলের বোঝা কিছুটা হাল্কা হবে। ফলে তাঁরা লেখাপড়া ও বিচার-বিবেচনা করার সময় পাবেন। তাঁদের বক্তব্য, চার থেকে আটজন করলে অনেকেই ঝগড়াঝাঁটি করতে নেমে পড়বেন। ঝগড়া কেন সৃষ্টি হয়? ঝগড়া তখনই সৃষ্টি হয়, যোগ্যতা থাকুক, বা না-থাকুক, যখন নেতারা তাঁদের স্বজাতির লোক দিয়ে দপ্তর পূরণ করতে চান। দলিত এবং মুসলমান প্রতিনিধিদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাখা উচিত, যাতে এই সম্প্রদায়গুলি রাষ্ট্র-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। কিন্তু রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং ভূমিহার—এইসব জাতগুলির কথা চিন্তা করে লাভ? ঝগড়াঝাঁটির বীজ প্রথমে আপনারাই রোপন করেন, পরে তার বাহানা করে ভুল রাস্তা ধরেন। কংগ্রেসের নেতারা যতদিন না জাতপাত থেকে নিজেদের মুক্ত করছেন, ততদিন দেশের কোনো ভালো হবে না। রাষ্ট্রকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, তাঁরা তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন না। তাঁরা মনে করেন, নিজ নিজ জাতির পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও পথপ্রদর্শক হবেন! এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা তাঁদের ত্যাগ করতে হবে। কংগ্রেস নেতাদের সঠিক পথ হচ্ছে, জাতপাতের বেড়াজাল ভেঙে বিভিন্ন জাতপাতের সঙ্গে বিয়ে-থার মাধ্যমে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা। যখন ভূমিহারের সম্বন্ধী রাজপুত হবে, আর কায়স্থর জামাই ব্রাহ্মণ হবে, তখন আর কোনো ঝগড়াঝাঁটিই থাকবে না। আপনি আপনার হাজার হাজার বছরের মূর্খতাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাম্প্রতিক কালের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করতে চাইছেন, কিন্তু তা কখনই সম্ভব

নয়। আপনাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। কখনো কখনো আপনারা এই দুর্বলতার অস্তিত্বকে অনুভবও করেন। মনে করেন, এ তো আপনার একান্ত ব্যক্তিগত। আপনি ব্রহ্মচারী হন, বা না হন, আপনি মদে আসক্ত হন, বা সাত্ত্বিক হন, আপনি আমিষভোজী বা নিরামিষাশী হন,—এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে আগলে রাখার জন্যে অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীবদ্ধতা, জাতপাতের ভাবনা, চাকরিতে নিয়োগ, সংসদ-সদস্য মনোনয়ন ইত্যাদির জন্যে যদি আপনি অসৎ পথ বেছে নেন, তাহলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আপনি সবচেয়ে বড় অপরাধ করবেন। জাতপাতের ভাবনা কংগ্রেসের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক জিনিস এবং এই ভয়ঙ্কর রোগে আমাদের কংগ্রেসের ছোট ছোট নেতারাই শুধু নন, অনেক তাবড় তাবড় নেতারাও আক্রান্ত। এই জাতপাতের প্রশ্নটিই আমাদের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে পচাগলা এবং দুর্গন্ধময় পদার্থ। তরুণদের এর বিরুদ্ধে তাদের অভিমতকে দৃঢ় করতে হবে, এবং কোনো লাভ-লোকসানের কথা না ভেবে এর বিরোধিতা করা উচিত। এত-দিন পর্যন্ত আমাদের সমস্ত কর্মসূচী ছিল কল্পনার রাজ্যে। কিন্তু এখন তা বাস্তব ভূমির ওপর দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস নেতাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। কাজেই ভাবনা চিন্তা যদি সেই আগের মতোই থাকে, তাহলে তা কংগ্রেসকে ধ্বংস না করে দিলেও, দুর্বল করবে,—তার বদনাম হবে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লোকে জাতপাতের দিকে দৃষ্টি রেখে, আপন জাতভাই এবং বন্ধুবান্ধবদের চাকরি দেবার ব্যবস্থা করবে, আর বদনাম কুড়োবে কংগ্রেস। আগেকার মন্ত্রীরা এ ধরনের অনেক দুষ্কর্ম করে কত অপদার্থ ও নিষ্কর্মাকে যে প্রফেসর এবং ডাক্তারের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। এ-সব পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁরা প্রচুর টাকা মাইনে নেন আর কাজের কাজ যা করেন, তা হচ্ছে তোষামোদি করা, ঘুষ খাওয়া পক্ষপাতিত্ব করা এবং সামাজিক বৈষম্যকে ছড়িয়ে দেওয়া। যদি কংগ্রেস নেতৃত্ব এই ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রশ্রয় দেন, তাহলে যেমনভাবে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বাররা এবং ধাপ্পাবাজ ঠিকেদাররা টাকা লোপাট করে, ঠিক তেমনি ঘটনা সরকারেও ঘটবে। লক্ষ্য করে দেখবেন মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে যে একমাইল রাস্তা তৈরি করেছে, কয়েক দিন বাদেই সে রাস্তা গাড্ডায় পরিণত হয়েছে। খোয়া বিছিয়ে একটু পিটিয়ে দেওয়া হয়। আর শহরের রাস্তাঘাট হলে, তার ওপর একটু পিচ ঢেলে দেওয়া হয়। ওভারসিয়র এবং ইঞ্জিনিয়াররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেন, কিন্তু ঘুষখোর মেম্বার এবং চেয়ারম্যানের ভয়ে ঠিকেদারের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না। দেখুন, কীভাবে ঘুষ, নজরানা, নোংরামি এবং সুপারিস ইত্যাদিতে বাজার রমরম করছে। সুতরাং কংগ্রেসীরা যদি তাঁদের জাতপাতের প্রশ্ন ত্যাগ

না করেন, তাহলে পরিবর্তনের কোনো আশা নেই। কারণ পরিবর্তন তো শুধু লম্বা-চওড়া কথার ভাষণ নয়। দুর্নীতিকে দূর করতে হলে কখনো কখনো কায়স্থ জাতভাইকে বড়বাবুর পদ থেকে অপসারিত করতে হবে, কখনো কোনো ভূমিহার জাতভাইকে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদ থেকে বিতারিত করতে হবে। এরা সবাই অকর্মণ্য, কোনো না কোনোভাবে নিজেদের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। যে ঘুষ খাওয়া এবং প্রতারণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন কোনো না কোনো মন্ত্রী বা মেম্বারের জাতভাইরাই তা করছে। খোঁজখবর নিলে তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও বেরিয়ে পড়বে। এই জাতপাত সমস্যা কোনো কিছুরই পরিবর্তন ঘটাতে দেবে না। আগে সমস্ত বিভাগের মাথায় বসে থাকত ইংরেজরা, তাদের ভাই-বন্ধুর সংখ্যা ভারতবর্ষে খুব কমই ছিল। সেজন্যে অধিকাংশ সময়ে তারা যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দিত। আর এখন, সব বিভাগের মাথার ওপর ভারতীয়রা বসে আছে, তারাই তাদের ভাই-বন্ধু আত্মীয়স্বজনের সরকারি চাকরি দিয়ে সরকারি দপ্তরগুলিকে দুর্নীতির আখরায় পরিণত করেছে। আমরা যদি জাতপাতের সমস্যার ওপর দৃষ্টি না দিই, তবে তাদের কীভাবে হটানো যাবে?

এই তিক্ত এবং সত্য কথা বলার জন্যে আমাদের কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং মন্ত্রীরা আমাকে ক্ষমা করবেন। যে ভয়ঙ্কর সমস্যার দিকে আমি তাঁদের দৃষ্টি ফেরাতে চাই, তা যদি তাঁরা প্রতিরোধ করতে না পারেন, তবে তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। সংক্ষেপে বলছি, মন্ত্রীদের উচিত কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে লড়াই করা এবং অতি দ্রুত জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা। সরকারি চাকরি এবং সর্বজনীন সংস্থাগুলিতে যত জঞ্জাল আছে, তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে সংসদ-সদস্য নির্বাচন করতে হবে, মনোনয়নের মাধ্যমে নয়। যদি আপনারা তা না করেন, তাহলে কংগ্রেসের মধ্যে কোঁদল অবশ্যই ঘোরাল হয়ে উঠবে। শ্রমিক কৃষক এবং সাম্যবাদীরা এই নরক তুল্য কংগ্রেসের গোলাম নন। তাঁরা তাঁদের প্রতিটি কথায় মাথা নাড়িয়ে সায় দেবেন না।

জমিদারী প্রথা চাই না

শুক্রবার (আগস্ট, ১৯৩১) বিহারে জমিদারদের এক সম্মেলন হয়, এই সম্মেলনে তাদের উপস্থিত এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল অভূতপূর্ব। 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এর খবর অনুযায়ী এই 'প্রদেশের' প্রতিটি কোণ থেকে অসংখ্য জমিদাররা এই সম্মেলনে আসে। বিরাট হল এবং হলের বাইরে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। বড় বড় খেতাবধারী রাজা মহারাজাদের সঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট জমিদাররাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামিল হয় এবং সমগ্র জমিদার শ্রেণীর সামনে যে-সমস্যাগুলি উপস্থিত হয়েছে, তা সমাধানের জন্যে তারা উদ্বিগ্ন ছিল। সামান্য একটু আতঙ্কের ছায়া দেখে, জমিদার শ্রেণীর মধ্যে জাতি এবং সম্প্রদায়গত যে বন্ধন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে সে উদ্দেশ্যেই যে এই মহান্ ঐক্য তা বিশেষভাবে অনুভব করা গেছে।

বিহারের জমিদাররা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তাদের ভাই-বন্ধুদের মতোই বর্তমান সরকারের শক্তির ওপর অগাধ আস্থা পোষণ করত। কারণ কংগ্রেসের আদর্শ এবং তার কার্যক্রম ছিল এমনই যার মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন কোনোদিন পূরণ হবার নয়। এই কারণে স্বয়ং জমিদারদের নিজস্ব সংগঠনের সদস্যপদ দেওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ ছিল। বৃহৎ জমিদাররা ছোট ছোট জমিদারদের কোনো পাত্তাই দিত না। এ-সময়কার 'জমিদার সভা' শুধু বড় বড় জমিদার এবং রাজা মহারাজাদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তাদের স্বশ্রেণীর মধ্যেও ঐক্য ছিল না। তাদের সভাপতির এখন একথা বলা খুবই অনুচিত বলে মনে হয় যে, 'এই শোচনীয় অবস্থার সবচেয়ে বড় কারণ, যে-দিকে দেশ অগ্রসর হচ্ছে, সেই প্রজাতন্ত্রের মর্মবস্তু আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হইনি।' সে-সময় ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন অত সহজ ছিল না এবং প্রজাতন্ত্রের জন্যে প্রচারকার্য চালানোকেও দোষের বলে মনে করা হতো। সে-সময় জমিদাররা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে যা যথার্থ মনে করেছে, তা তারা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছে। জমিদারদের এখন এ-কথা বলা ঠিক নয় যে, দীর্ঘদিন ধরে যে-সব রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল, আমরা তার নীরব দর্শক ছিলাম, কারণ আগেকার সরকার আমাদের রক্ষা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই জন্যে আমরা আমাদের পুরানো ঐতিহ্য এবং আইন মোতাবেক কাজ করে সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু জমিদাররা শুধু নীরব দর্শক ছিল না, রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় তারা সরকারের সক্রিয় সমর্থকও ছিল, তারা শান্তি কমিটিগুলির সংস্থাপক এবং পরিচালক ছিল। তদুপরি তাদের লোকবল এবং ধনবলও ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনকে পিষে মারার

জন্যে তারা পুলিসকে সহযোগিতা করেছে। যখন গুলি-গোলা চলত, তখন নিহত এবং আহত মানুষদের দেখেও, না-দেখার ভান করত। বরং এরা পুলিসকে আমন্ত্রণ জানিয়ে খানাপিনার ব্যবস্থা করত। অবশ্যই 'দেশ-ভক্তি কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর একক সম্পত্তি নয়।' কিন্তু জমিদার শ্রেণী নিজেদের হীন শ্রেণীস্বার্থের জন্যেই জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। যদিও দেশের অগণিত মানুষের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল অত্যন্ত আবশ্যক, আর সে-আন্দোলনে জমিদারদের সম্পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করা উচিত ছিল। অথচ এখন তাদের অংশগ্রহণ করা যেন জরুরি হয়ে উঠেছে। জমিদার-দের প্রতিনিধি হিসেবে রাজা-মহারাজারা বিতর্ক তুলে বলছে, 'আমাদের বিশ্বাস, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এ কথাকে স্বীকার করবেন, জমিদাররাও দেশের উন্নতির জন্যে বিগত বছরগুলিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, কারণ আমরা বিদেশী নই, আমাদের সুখ-দুঃখ দেশের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।' জমিদাররা কি অংশগ্রহণ করেছিল? কিসে করেছিল? দেশের উন্নতির জন্যে? এ-কথা ব্যক্ত করে সত্যিই তারা সাহসের পরিচয় দিয়েছে—যারা সর্বদা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ছিল, এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যেই এই বিশেষ শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল। তারা কেবলমাত্র নিজেদের অপার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের জন্যে যা করার করেছে—তার ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট বেড়েছে। জমিদারেরা কি বিহারের জাতীয় শিল্পকলাকে মদত জুগিয়েছে? তারা কি জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি মানুষের রুচি সৃষ্টি করেছে? তারা বলে, তারা নৃত্য এবং সংগীতের 'রক্ষক' ছিল, কিন্তু তারা কোন শিল্পকলাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছে? এ-ধরনের মানুষদের কাছ থেকে শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির উন্নতির আশা করা বৃথা।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে, এই মহারাজাধিরাজ বলেছেন, 'আমি এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে প্রস্তুত নই, জমিদারী প্রথা ধ্বংস করে কৃষক-দের মঙ্গল হবে। অনেক চিন্তাভাবনা করেই জমিদারী প্রথার শুরু হয়। কাজেই তা উচ্ছেদ করলে সামগ্রিকভাবে প্রদেশের সামাজিক এবং আর্থিক কাঠামো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই ধরনের প্রচেষ্টা চালালে অরাজকতা এবং অশান্তিই সৃষ্টি হবে। এবং জমিদার ও কৃষকরা—উভয়েই এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়বে।' জমিদারী প্রথা ধ্বংস হলে নিশ্চয়ই কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হবে। কৃষকদের এই দুরবস্থার জন্য প্রধানত দায়ি জমিদারী প্রথা। গ্রামীণ গরিব জনসাধারণের দুঃখের অনেক কারণ আছে। কিন্তু জমিদারী প্রথার জন্যে তারা গোলামদের চেয়েও নিকৃষ্টতর জীবন-যাপন করছে। জমিদার হুকুম দিলেই তাদের বেগার খাটতে হয়। তাদের মালিকের সমস্ত রকম বেআইনী দাবি ও ইচ্ছাকে পূরণ করতে হয়। এমন কি

তাদের জীবন, মানমর্যাদা সবই জমিদারদের সম্পত্তি লোলুপতা এবং ক্রোধের জন্যে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। জমিদারী প্রথার মধ্যে যদি কোনো অন্যায়-অবিচার নাও থাকে তাহালেও এই প্রথা মানুষের মধ্যে যে হীন মনোবৃত্তি সৃষ্টি করেছে, শুধু তার জন্যেই তা বিলুপ্ত হওয়া উচিত।

সবাই খুব ভালোভাবে জানে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব আদায় করার জন্যে এই জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করে। কারণ সেই অশান্তির দিনগুলিতে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা খুব সহজ ছিল না। জমিদারী প্রথা কৃষকদের বা দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রবর্তিত হয়নি। জমিদারী ব্যবস্থা এ-কথাই প্রমাণ করেছে, এ হচ্ছে জমির ওপর এক বোঝাস্বরূপ প্রথা। জমির ওপর নির্ভর করে এই বিপুল জনসংখ্যা বেঁচে থাকতে পারে না। কল-কারখানা স্থাপনের জন্যে পুঁজিপতিদের অন্তত কিছুটা কাজকর্ম করতে হয়। কিন্তু জমিদারদের তাদের আয়ের জন্যে কোনো রকম কাজ করতে হয় না। আর এই আয় চিরস্থায়ী এবং তাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। এই সব বড় বড় জমিদার-দের মধ্যে পাশ্চাত্যের ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। পাশ্চাত্যের জমিদারদের মধ্যে যে-সব বদ অভ্যাসগুলি আছে, তা এদের মধ্যেও বাসা বেঁধেছে। জমিদাররা আলসে, অন্যের শ্রমের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের আর কোনো গতি নেই। যদি সত্য কথা জিজ্ঞেস করেন, বলব, জমিদারী প্রথা যেমন অসামাজিক, তেমনি অর্থ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সঠিক নয়। জনসাধারণের সুখ-শান্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এমন প্রথা বিলুপ্ত করা উচিত।

কৃষক নেতারা তাঁদের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে দৃঢ়সংকল্প, কোনো অব্যবস্থা, অশান্তি, হাঙ্গামা বা ভয় তাঁদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবে না। অরাজকতা এবং অশান্তির ভয় দেখিয়ে সংখ্যায় মুষ্টিমেয় জমিদার শ্রেণীর কিছু করা সম্ভব নয়। যেমন বিহারের জমিদাররা, তাদের না আছে কোনো নৈতিকতা না আছে কোনো রাজনৈতিক বল, তারা এক বিচিত্র শ্রেণী। তারা যদি অরাজকতা এবং অশান্তির ভয় দেখায়, তা হবে তাদের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। আমরা জানি, আমাদের এই প্রদেশে এমন কিছু জমিদার আছে, যারা গত নির্বাচনে অনেক হাঙ্গামা এবং অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছে এবং নিজেদের জমিদারীর দাপট এখনও বহাল রাখতে চাইছে। কিন্তু এখন তাদের বোঝা উচিত, এ-সব করলে তারা মারা পড়বে। তাদের জেনে রাখা ভালো, কেবল বিনয়ী হলে এবং করজোর করলেই তারা একটু শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারবে। তারা কি বুঝতে পারছে না, আজ পর্যন্ত যে-শ্রেণীর সমর্থন নিয়ে তারা বেঁচে ছিল, তা তারা হারিয়েছে? এ-কথা ঠিক যে, তাদের অর্থের দাপট আছে, কিন্তু তারা যদি এ-দেশের মানুষের ক্রোধ এবং ঘৃণাকে পিষে মারার জন্যে সে অর্থ ব্যয় করে, তবে অর্থও তাদের কাছে আর থাকবে না। তাদের সভাপতি

বলেছে, 'আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে কোনো শ্রেণীর ইচ্ছা এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ছেড়ে দিতে পারি না। সে-শ্রেণী যতই সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক, এবং তারা যতই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করুন না কেন।' এ হচ্ছে জমিদারদের এক ধরনের বিনয়ীভাব, কার্যত তারা ধমকই দিচ্ছে। কিন্তু তারা কি আমাদের দয়া করে বলবে, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কি? তারা যা কিছু করেছে তা তাদের বিদেশী প্রভুর জন্যে প্রাণপাত করে করেছে। কিন্তু এখন প্রভুর পরিবর্তন ঘটায় তারা আবার তাদের অধিকারকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে চাইছে। এই জমিদার শ্রেণীতে যত পুরুষ এবং নারী আছে, তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে সমাজের দয়া ও করুণার ওপর।

দেরি করার কৌশল ব্যর্থ

দেরি করার কৌশল ব্যর্থ হবেই। আপার চেম্বারের ওপর জমিদার শ্রেণীর আস্থা না রাখাই ভালো। কারণ কোনো প্রস্তাবকে অনিশ্চিত কালের জন্যে ফেলে রাখা আপার চেম্বারের এক্তিয়ার ভুক্ত নয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাকে সে কাজ করতে হবে, অথবা দ্রুত দু'টি কাউন্সিলের যুগ্ম অধিবেশন ডাকতে হবে। যদি এ-কথা স্বীকার করে নিই যে আপার চেম্বারের চাল কার্যকরী হলো, তাহলেও সরকার তা নীরবে স্বীকার করে নেবে না। সরকার দ্বিতীয় বার নির্বাচন করতে পারে, আর তাতে জমিদারের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে।

দ্বিতীয় আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস ছোট জমিদারের সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করতে চাইছে, তা বড় জমিদারের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ছোট জমিদার—যাদের আয় বছরে ১০,০০০ টাকার চেয়ে কম তারা বড় জমিদারের চাইতে কংগ্রেসের কাছে ভালো ব্যবহার অবশ্যই আশা করে। তাদের কৃষি করের জন্যে ভয় পাওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, তারা যাতে কৃষি করে ছাড় পায় সে দিকে নজর দিতে হবে এবং কৃষকদের এই অসহনীয় অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে সরকারের উচিত আইনের সহযোগিতা দেওয়া। প্রযুক্তি সম্পর্কে যে নতুন পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে, তার সুযোগ সুবিধা ছোট জমিদারদের ভবিষ্যৎ জীবনকে যেন সুখপ্রদ করে তোলে। যখন সামাজিক সম্পদকে জাতীয় বা সামাজিক রূপদানের সুযোগ আসবে, তখন কংগ্রেস সরকার নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করবেন, ছোট ছোট জমিদারদের যেন কষ্ট না হয়। বড় জমিদাররা ছোট জমিদারদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে না, কিন্তু তারা যদি ছোট জমিদারদের ওসকায়, তাহলে তাদের ভুগতে হবে। ছোট ছোট জমিদাররা যদি খুব গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে—নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে তাহলে তারা বুঝতে পারবে এতে তাদের উপকার হবে। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে যে-সব আইন প্রণয়ন করবেন, তা তাদের সমর্থনের জোরেই

করবেন। জমিদাররা যেন মনে না করে, তারা যে-কোনোভাবে হোক কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবে। আর বল প্রয়োগ করলে তাদের শ্রেণীই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আপার কাউন্সিলে চাল চেলে কোনো সিদ্ধান্তকে তারা কিছু-দিনের জন্যে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, মতানৈক্য সৃষ্টি করে তারা কোনোরকম লাভবান হবে না।

জমিদাররা মিথ্যা আশা পোষণ করে, ব্রিটিশ সরকার বা সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পেছন থেকে মদত জোগাবে এবং বিধানসভা বা কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী ভেঙে দিয়ে তাদের স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করে তুলবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ব্রিটিশ সরকারকে কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেই হবে। একবার বা দু'বার কংগ্রেস এবং মন্ত্রিমণ্ডলীকে ভেঙে দিয়ে জমিদারদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। মিশরের ওফদ মন্ত্রিমণ্ডলীকে ব্রিটিশ সরকার দু'-দু'বার ভেঙে দিয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে শান্তির জন্যে মাথা নত করতে হয়েছে। আমরা পরবর্তী সময়ে দেখেছি, ব্রিটেনের হোমড়া-চোমড়ারা ওফদ নেতাদের এবং মিশরের প্রধানমন্ত্রীকে কীভাবে স্বাগত জানিয়েছে। স্বয়ং ব্রিটেনই রাষ্ট্রসঙ্ঘে সদস্যপদ পাওয়ার জন্যে মিশরের নাম প্রস্তাব করেছে। আর এখন মিশর রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্রিটেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের মতো সম মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য। মিশরের ভাগ্য এখন পূর্বেকার ওফদ পার্টির হাতে। ব্রিটেনের দূরদর্শীতার খবর সবাই জানে, এবং সবাই জানে আর কিছুদিনের মধ্যে ব্রিটেন কংগ্রেসের সঙ্গে অবশ্যই আলাপ-আলোচনায় বসবে।

জমিদারদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে, কিছু অর্থের বিনিময়ে তাদের অধিকার ছেড়ে দেওয়া। আর সেই টাকা দিয়ে তারা নতুনভাবে জীবন শুরু করতে এবং দেশের শিল্পের জন্যে টাকা খাটাতে পারে। স্বার্থ রক্ষার জন্যে ব্রিটেনের জমিদাররা যা করেছে সে উদাহরণ দিয়ে কোনো লাভ নেই। ব্রিটেনের অধিকাংশ জমিদার শিল্পক্ষেত্রে তাদের পুঁজি নিয়োগ করেছে। যদি অর্ধেক কৃষককেও শিল্পে নিয়োজিত করা যায়, তাহলে আমাদের জমিদাররা ব্রিটেনের মতো উদাহরণ সৃষ্টি করবে। দেশকে শিল্পোন্নত করার জন্যে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এক বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ হবে। কারণ, এই অনুৎপাদক ব্যবসায় কোনো টাকা না খাটিয়ে, বরং যে-টাকা তারা পাবে তা তারা নতুন শিল্পোদ্যোগে খাটাক। তা করলে হাজার হাজার অলস মস্তিষ্ক এবং হাত জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কাজে নিয়োজিত হতে পারবে।

কৃষকেরা, হুঁশিয়ার!

ভারতীয় কৃষকদের আর্থিক অবস্থা কী শোচনীয় তা তারা নিজেরাই জানে না। যারা কৃষক সমাজের বাইরে, তারাও তা ভাবতে পারবে না। আমাদের কৃষকদের দারিদ্র্যের তুলনা করতে হলে, ভারতের বাইরে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা জানার প্রয়োজন। এমন শোচনীয় দারিদ্র্যে নিমজ্জিত কৃষকদের মধ্যে কংগ্রেস জাগৃতি, জীবন এবং আত্মসম্মানবোধ এনেছে। তারা জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেও কৃষকদের মধ্যে জাগরণ এসেছে, কিন্তু বিহারের কৃষকদের মধ্যে যে জাগরণ এসেছে, তা অভাবনীয়। এখানে তারা বেশ সংগঠিতও। বিহারে বড় বড় জমিদারী এবং ইস্তমরারী বন্দোবস্ত থাকার জন্যে কৃষক এবং জমিদারদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বিভাজন হয়েছে। দু'টি শ্রেণীই তাদের স্বার্থ, সুখ-দুঃখ এবং সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে এত ভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে যে, এই বিভাজন রেখা টানার জন্যে কংগ্রেসকে আন্দোলন করতে হয়নি। শুধু বক্তব্যের ধোঁয়াশাগুলিকে স্পষ্ট করে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। আর তাঁরা তা করেও ছিলেন। বিহারের কৃষকদের শক্তি কী প্রবল, তা বোধহয় আমাদের নেতাদের যারা জমিদারদের সঙ্গে মিলেমিশে চা খাচ্ছে এবং হাতে হাত মেলাচ্ছে তাদের ধারণা নেই। এমন কী সাধারণ কৃষকরাও এ ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু আমাদের কৃষক-নেতৃত্ব এ-শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, আর সাম্যবাদীদেরও এ-শক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা খুব জরুরি। সে জ্ঞান তাদের আছেও। কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট আর কোনো কল্পনার বিষয় নয় যে, আপনি তাকে অজস্র কথার জাল বুনে বা টালবাহনা করে দূর করতে বা তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন। কৃষকদের বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। শুধু জিভ নাড়ালে, আর কাগজে কালি ঢাললেই, তাদের সুখী করা যাবে না। ১৯২১ সাল থেকেই তারা কংগ্রেসী-দের উপদেশ শুনে আসছে, তাদের এই সামান্য জ্ঞানও আছে যে, কীভাবে অন্ন-বস্ত্র ছাড়া তারা দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটাচ্ছে। তারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের একটি উপদেশ বাক্যও শুনবে না, তারা জিজ্ঞেস করবে—প্রথমে আধ পেট খেতাম, এখন তোমরা আমাদের পৌনে এক পেট খাবার দেবে, কি দেবে না? আগে আমরা একটা ধুতি দিয়ে গোটা বছরটা কাটিয়ে দিতাম, এখন কি আমরা একটা ধুতির সঙ্গে একটা গামছাও পাব না। মোট কথা হচ্ছে, তারা আপনাদের কাজ চোখে দেখতে চায়।

শুনেছি, আপনারা জমিদারদের সঙ্গে আপসরফা করছেন। মন্ত্রীদের মধ্যে জমিদারদের সংখ্যাই বেশি, সে-সম্পর্কেও সবাই বলাবলি করছে। আমার মনে হয় মন্ত্রীরা স্বার্থপর এ কলঙ্ক তাঁদের দেওয়া যায় না। কিন্তু জমিদারদের সঙ্গে

অত্যন্ত মাখামাখি এবং বন্ধুত্ব অবশ্যই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের এখানে বিয়ে-থা, জাতপাতের সম্পর্কও এ-বিষয়ের ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। জমিদারদের বিতাড়িত করতে হবে, আর তা যত দ্রুত সম্ভব করা চাই। তাদের সঙ্গে আমাদের নেতারা আপসরফা করতে চাইছে, আর তারা সে আপসরফা কৃষকদের নামেই করবে। কৃষকদের ভোটে জয়যুক্ত হয়ে কংগ্রেস সরকারে এসেছে। কৃষকরাই মন্ত্রী এবং মেম্বার বানায়, সুতরাং তারা আপসরফা করলে, তা কৃষকরা করেছে বলেই মনে করা হবে। আর এই আপসরফা জমিদাররা তাদের অধিকারের সনদ হিসেবেই জাহির করবে।

কৃষকরা এখন এক ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কারণ তারা যাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে, তাঁরা এখন কিছু করার অধিকারী। যদি এখন তাঁরা কৃষকদের বিরুদ্ধে কিছু করে ফেলেন, তবে তাদের হঠানোর জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। এই সেদিন, বিধানসভার উদ্বোধনের সময় পঞ্চাশ হাজার কৃষকদের জমায়েত দেখে জমিদারদের বুক ধড়াস ধড়াস করে ওঠা তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমাদের নেতৃবৃন্দ একে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বললেন—কেন তারা কি আমাদের বিশ্বাস করে না ? আমরা কি কৃষকদের আপনজন নই ? এর উত্তরে আমি বলব, যারা ভেতরের কথা বেশ ভালোভাবে জানে, তারা তো এই মুহূর্তে চিন্তিত এবং সতর্ক হয়ে উঠেছে, আর সাধারণ মানুষদের বুঝতে বেশি সময় লাগবে না। যদি কৃষকরা সজাগ এবং তাদের অধিকারের জন্যে বিরাট আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত না হয়, তাহলে তারা বিভ্রান্ত হবে। বড় বড় জমিদাররা খুব ভালোভাবেই জানেন, এ-তাঁদের শ্রেণীর কাছে জীবন মরণ সমস্যা। যদি তাঁদের কাছে অস্ত্র থাকত, তাহলে তাঁরা প্রকাশ্যেই লড়াই করতেন। কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা নেই। এক প্রভাবশালী জমিদার নেতা তো বেকুবের মতো দু-একজন কংগ্রেস মন্ত্রীকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়। বুঝুন, এই ভয়ে কংগ্রেসী-মন্ত্রিমণ্ডলী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জমিদারদের আয়ের ওপর যে ট্যাক্স বসাতে চাইছেন, তাতে জমিদারদের মাত্র ৩০-৪০ লাখ টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। আমাদের হিসেবে এর পরিমাণ হওয়া উচিত দু' কোটি টাকা। এত টাকা কি জমিদাররা আনন্দে আটখানা হয়ে দেবে ? তার চেয়েও বড় কথা, জমিদারী প্রথার ওপরই তো খাঁড়া ঝুলছে। তারা কি তা নীরবে মেনে নেবে ? তারা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছে। সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ—সব উপায়ই ভাবছে। যেখানে ঘুষ দেয়ার প্রয়োজন, সেখানে তারা লক্ষ টাকা উপঢৌকন দেবে। যেখানে জাত-ভাইদের দিয়ে কাজ হবে, সেখানে তারা তাদের কাজে লাগাবে। কৃষকরা, হুঁশিয়ার হও। চোখ খুলে তাকিয়ে থাকো, যেন তোমাদের প্রতিনিধিরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে না পারে।

আগে কংগ্রেস তার প্রতিনিধিদের সরকারি আমলাদের দেওয়া চা-পার্টি এবং

তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার বিরুদ্ধে ছিল। আমি মনে করি, কৃষকদের শক্তিই কংগ্রেসের শক্তি কাজেই তার প্রতিনিধিরা যেন আগের মতোই জমিদারদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি না করে,—তাহলে এর পরিণাম খুব খারাপ হবে।

কৃষকদের এই প্রথম মিছিল এবং জমায়েত দেখে ওপর তলার কিছু নেতা ক্ষেপে উঠেছেন। এখন এর চেয়েও বিরাট বিরাট জমায়েত দেখার জন্যে তাঁদের তৈরি থাকতে হবে। হয়তো আগামীকাল কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী দু-একটি ছুতো খুঁজে বের করে 'সেলামি-সার্টিফিকেট' প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইবেন। জমিদারী প্রথা উঠিয়ে দেয়া এবং লাঙল যার জমি তার এই ন্যায্য অধিকারে তাঁরা সায় দিচ্ছেন না। যদি মন্ত্রীরা এ-ধরনের দুর্বলতা দেখায় তাহলে কৃষকরা তা মেনে নেবে না। সে কারণেই গত জমায়েতটা হয়েছিল এবং সে জন্যে বিশেষ প্রস্তুতি এবং প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু আগামী শীতের সময়ে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, তাতে বিহারের সব প্রান্তের কৃষকদের এক সংগঠিত ঐতিহাসিক জমায়েত পাটনায় হওয়া উচিত। কৃষক নেতৃত্বকে সেজন্যে প্রথম থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। বিহারের প্রতিটি জেলা থেকেই শুধু নয়, প্রতিটি থানা থেকে নির্বাচিত কৃষকদের দল যেন পদযাত্রা করে। আর তাদের বিশ্রাম ইত্যাদির জন্যে আগে থেকেই যেন স্থান নির্ধারিত করা থাকে। গোটা জেলার সমস্ত মিছিল কোথায় মিলবে, কবে সারা প্রদেশের কৃষক পাটনায় জমায়েত হবে, তা-ও যেন আগে থেকেই ঠিক করা হয়। পদযাত্রা যে-সব অঞ্চল দিয়ে যাবে, সে-সব অঞ্চলে কৃষকদের অধিকার এবং কর্তব্য প্রচার করতে করতে যাবে। সেই সঙ্গে যোগ্য নেতাদের নেতৃত্বে এত দিন ধরে পদযাত্রায় তারা অনুশাসন পালন করা এবং সংগঠিত হওয়ারও খুব সুন্দর সুযোগ পাবে। সেদিন পাটনায় একলক্ষ কৃষক জমায়েত করা তেমন কঠিন হবে না। কিন্তু সংখ্যায় তারা যতই হোক না কেন, তাদের সম্পূর্ণ সংগঠিত হওয়া উচিত। তাদের মিছিল দেখলেই যেন বলে দেওয়া যায়, তারা কোন জেলা কোন থানা থেকে এসেছে। আর তারও যেন ব্যবস্থা করা হয়। কৃষকদের দাবিপত্রগুলি স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় লিখে এবং তাতে প্রতিটি থানার যত বেশি সম্ভব কৃষকের স্বাক্ষর ও টিপ সই সংগ্রহ করতে হবে। দাবিপত্রগুলি একটি সিন্দুকে ভরে দু'জন কৃষক সেই সিন্দুক মাথায় নিয়ে মিছিলের অগ্রভাগে হাঁটবে। সেই সিন্দুকের সামনে কাপড়ের ব্যানারে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকবে কত জন কৃষকের তাতে স্বাক্ষর আছে, কৃষক সঙ্ঘ, থানা এবং জেলার নাম। যাতে দর্শকদের কোনো প্রশ্ন করতে না হয়। একটা জেলার মিছিল জড়ো হলে, সেই জেলার বিভিন্ন থানার মিছিলগুলি যেন আগে পিছে করে সাজানো হয় এবং প্রতিটি থানার মিছিলের সঙ্গে কৃষকদের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র সম্বলিত সিন্দুক থাকবে। জেলার স্বাক্ষরের সংখ্যা যেন জেলার ব্যানারের নিচে লেখা থাকে, সেই সঙ্গে লেখা থাকবে কত জন কৃষক পদযাত্রায় অংশগ্রহণ

করেছে। এ-সব দরকার এ-জন্য যে মানুষকে বোঝানো, পাটনায় পদযাত্রা করে যত মানুষ এসেছে, তারা কৃষকদের অধিকারের জন্যে আন্দোলনে প্রস্তুত। কারণ তাদের পেছনে আছে এক বিরাট সংখ্যক জনমত। যদি কৃষকদের মিছিল প্রতিরোধ করা না হতো, তাহলে এ জমায়েত—এ মিছিল আরও অনেক গুণ বড় হতো।

কৃষক এবং খেতমজুরদের অধিকারের আন্দোলন কার্যত একই সমস্যার দুটি রূপ। দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, খেতমজুরদের অবস্থা খুবই শোচনীয় এবং তাদের সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, আমরা সব বিপ্লব একসঙ্গে করতে পারব না। সব ক্ষেত্রে একই সঙ্গে লড়াই চালাতে পারব না। কৃষকদের সঙ্গে খেতমজুরদের লড়াই বাধিয়ে দেয়ার জন্যে জমিদাররা কোনো চেষ্টার ত্রুটি করছে না। আর জমিদারদের ভোট দেয়ার জন্যে যারা দৌড়-ঝাঁপ করছে, বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছে, খেতমজুরদের জন্যে তাদের হৃদয়ে দয়া উথলে উঠছে। তাদের এই উথলে-ওঠা দয়া দেখে কৃষক এবং খেতমজুর দু'জনেরই সাবধান থাকা উচিত।

বিহার কয়েকবার দেশকে পথ দেখিয়েছে, এবারও বিহারের কৃষকরা ভারতবর্ষের কৃষকদের পথ দেখাক।

হরিজনদের কি প্রয়োজন ?

যারা উচ্চ বর্ণ তারা হরিজনদের সঙ্গে কি ব্যবহার করে, তা কোনো বিদেশীর পক্ষে —যারা এদেশে আসেননি, তাঁদের কাছে বিষয়টি বোধগম্যের বাইরে এবং অসহ্য। তাদের ওপর ধর্মীয় অত্যাচার এবং সামাজিক অন্যায় তো চলে আসছেই, কিন্তু অত্যাচারের চূড়ান্ত রূপ তখনই দেখা যায়, যখন তাদের জীবন নির্বাহ করতে পারে এমন কোনো পেশা গ্রহণে বাধা দেয়া হয়। মনিহারি দোকান, মিষ্টির দোকান বা হোটেল খোলার কথা তো ওঠেই না, কাপড় এবং রাসায়নিক দ্রব্যের দোকানও খুলতে পারে না তারা। যদি দোকান খোলেও, তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই সে দেউলিয়া হয়ে যাবে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা কৃষির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক হরিজনেরই জমি আছে। সামান্য কয়েকজন হরিজনের কাছে যদি যৎসামান্য জমি থেকেও থাকে, তার পরিমাণ কয়েক কাঠার বেশি নয়। সিকমী ভাওলী প্রথানুসারে সে জমিও যখন ইচ্ছে বেদখল করা যেতে পারে। এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই আমাদের কোনো কোনো নেতা হরিজনদের ওপর যে অত্যাচার চলে আসছে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেন। যদি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলব, মহাত্মা গান্ধীর উত্থানের পূর্বে আমাদের এই ভাইদের জাগরণের প্রশ্ন নিয়ে কোনোরকম গভীর-চিন্তাভাবনা করা হয়নি। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে এখনো যা চিন্তাভাবনা করা হয়, তা যথেষ্ট নয়। যদি ভারতবর্ষের সমস্ত মন্দির হরিজনদের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়া যায় তাতে এ-সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতের মানচিত্রের বাইরের কোনো দেশেও এ-ধরনের দারিদ্র্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যেও হরিজনদের যে দারিদ্র্য তা অকল্পনীয়। যে হরিজনদের অধিকাংশই খেতমজুর তাদের অবস্থা দাসদের চেয়ে ভালো নয়। সামান্য কয়েকটা টাকা ধার নিয়ে তারা নিজেদের শ্রম বেচতে বাধ্য হয়। তাদের প্রভু শুধু এই প্রয়োজনটুকু পূরণ করে, যাতে তারা কোনো রকমে প্রাণ ধারণ করতে পারে। পুরুষানুক্রমিকভাবে সময় বয়ে যায়, কিন্তু সেই ঋণ কোনোদিন শোধ হয় না। অন্য কাজ করারও তাদের স্বাধীন অধিকার নেই। অবশ্য তারা বিভিন্ন প্রান্তে—বাঙলা ইত্যাদিতে জীবিকার সন্ধানে যায়, কিন্তু তাদের রোজগারের একটা বড় অংশই তাদের প্রভু এবং মহাজন-সুদখোরদের কাছে চলে যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য গ্রামীণ জনতার মতো, তাদেরও গ্রামের প্রতি এমন মমতা যে তারা তাদের হত-দরিদ্র ঝুপড়ি ছেড়ে যেতে নারাজ। শত-সহস্র বছর ধরে গ্রামের মোড়ল এবং তাদের সাগরেদরা এমন প্রথা কায়েম করে রেখেছে যে, সেই প্রথার মধ্যে তারা বেঁচে থাকতে পারে না। রাজদণ্ড থেকে

বাঁচা হয়তো হরিজনদের পক্ষে সম্ভব কিন্তু এই অমানুষিক খুনী প্রথা থেকে তারা বাঁচতে অক্ষম। বসবাস, ঘরের হাঁড়ি-কুড়ি, জামাকাপড় এবং ছাতা ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনেক রকম বিধিনিষেধ আছে। এই প্রথার সামান্যতম অবমাননা করা ঘোরতম অপরাধ, যদি অবমাননা করে, তবে গ্রামসমাজ তাকে শাস্তি দেবে। যদি আপনি হরিজনদের প্রতিদিনকার জীবনপ্রণালী খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন, দেখবেন, এদের বর্তমান অবস্থা শুধু যন্ত্রণাদায়কই নয়, তাদের ভবিষ্যৎও ভীষণ অন্ধকারময়। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাই সমস্ত স্বাধীনতার জননী, সেই স্বাধীনতার আলো থেকে এই অভাগাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কাজেই এদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা আমরা কী করে করতে পারি !

তাদের জন্যে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করার কাজে আমাদের বৃথা সময় ব্যয় করে কোনো লাভ নেই। এ শুধু ব্যর্থ কাজই নয়, হরিজনদের পক্ষে মারাত্মকও। বর্তমানে তাদের যে অধোগতি তার জন্যে দায়ি হচ্ছে পুরোহিতদের চালাকি এবং ধর্মান্ধতা। এই সরল মানুষদের এমন সস্তা ওষুধ দেবেন না। পুরোহিত, ধর্ম এবং মন্দিরকে জাহান্নামে যেতে দিন। যদি আপনার সামনে দেশপ্রেম এবং নিজের আদর্শ বলে কিছু থাকে, তাহলে হরিজনদের অর্থ নৈতিক বৈষম্যকে জানুন এবং তা দূর করার জন্যে সচেষ্ট হন। আমাদের এ-অঞ্চলে ৬৫ লক্ষের ওপর হরিজন আছে। এদের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা ৫ লক্ষের বেশি নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাকি ৬০ লক্ষের অবস্থাকে কিভাবে পরিবর্তন করা যাবে ? আমাদের অনেক জেলায় অধিকাংশ জমিই কৃষিযোগ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে সারণ জেলাকে ধরুন, এই জেলার ক্ষেত্রফল ২,৬৮৩ বর্গমাইল। এর মধ্যে ২,০৫৮ বর্গমাইল, অর্থাৎ ১৩,১৭,১২০ একর জমিতে আগে থেকেই চাষ-আবাদ হয়। ২০২ বর্গমাইল, অর্থাৎ ১,২৯,২৩০ একর জমি চাষের যোগ্য নয়। এর মধ্যে আবার গরু মোষের জন্যে চারণ ভূমিরও ব্যবস্থা করতে হবে। যদি সমস্ত জমি এই জেলার ২৪,৮৬,৪৬৮ জন মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়, তাহলে প্রত্যেকের ভাগে পড়বে মাত্র আধ একর করে। এই সামান্য জমির উপর নির্ভর করে কারও জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। এই জনসংখ্যর ২,৭১,০০০ হচ্ছে হরিজন। এই তথ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, কাজেই দু' লক্ষের চেয়েও বেশি খেতমজুরদের মধ্যে এই জমি বিলি করা সম্ভব নয়।

চাষের জন্য জমির ব্যবস্থা

সরকার কিন্তু একটি কাজ করতে পারেন। বিহারে এমন অনেক বড় বড় জমিদার আছে, কৃষি যাদের জীবিকা নয়, তাদের ওয়াকস্ত জমি অধিগ্রহণ করে হরিজনদের মধ্যে বিলি করতে পারেন। সর্বোচ্চ কি পরিমাণ জমি

একজন লোক রাখতে পারবে, তা সরকার নির্ধারণ করে দেবেন এবং বেশির ভাগ উদ্বৃত্ত জমি হরিজনদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করবেন। কিন্তু পূর্বে যে কথা উল্লেখ করেছি, বড় বড় জেলাগুলি, যেমন সারণ, চম্পারণ, দ্বারভাঙা এবং মজাফ্‌ফরপুর-এ কৃষিপোযোগী যে জমি আছে, তাতে চাষ আবাদ হচ্ছে। সুতরাং সে জমি হরিজনদের মধ্যে বিলি করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিহারের অন্যান্য অংশে নিশ্চয়ই এমন অনেক জেলা আছে, যেখানে কৃষিযোগ্য জমি আছে। সরকারের সে-সব জমির খোঁজ নিয়ে তা হরিজনদের মধ্যে বিলি করা উচিত। আমরা যদি খুব দ্রুত হরিজনদের অবস্থার পরিবর্তন করতে চাই তাহলে তাদের মধ্যে এ-রকম একটা বিলিবন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক। এভাবে আমরা গ্রামের প্রাচীন পন্থীদের চিন্তাভাবনার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারি। এর থেকে উচ্চ বর্ণের মানুষরাও অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। সরকার যদি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই সমস্যাটি নিজের হাতে তুলে নেন, তবে রাঁচী, হাজারীবাগ এবং পালামৌ প্রভৃতি জেলায়—যেখানে ঘন বসতি নেই, সেখানে অনেক ক্ষেতমজুরকে অনায়াসে বসানো যেতে পারে। হরিজনরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, বিশেষ করে কৃষিকার্যে তাদের জুড়ি মেলা ভার। সহযোগ সমিতি-গুলির সাহায্যে তাদের পরিশ্রমকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে এ-কাজের জন্যে সমিতিগুলির যে অর্থ ব্যয় হবে তা উঠে আসতে দেরি হবে না। কারণ পরিশ্রমই সবচেয়ে বড় সম্পদ।

কুটির-শিল্প

শহর এবং শহরতলীতে হরিজনদের জন্যে বস্তি তৈরি করতে হবে। যে-সব যন্ত্র বিদ্যুৎ বা বিদ্যুৎ ছাড়াই চলে তাদের সে-সব হস্তশিল্পের কলাকৌশল শেখাতে হবে। শহর এবং শহরতলীতে এলে তারা গ্রামের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে জীবনকে নতুনভাবে শুরু করতে পারবে। যদি আর্থিকভাবে তারা উন্নত হয়, শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে, তাহলে অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব বেশিদিন টিঁকে থাকবে না। এই আদর্শ বস্তিতে যদি উচ্চ বর্ণের কোনো বন্ধু এসে থাকতে চায়, তাহলে তাকে এই শর্তে থাকতে হবে যে, হরিজনদের সঙ্গে সমপর্যায়ের ব্যবহার করতে হবে, আর তাদের শ্রমকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা চলবে না।

সরকারি কলকারখানা

কংগ্রেস নিজের হাতে সরকারের দায়িত্বভার নিয়েছেন। কার্যত আমাদের প্রয়োজন অনেক কিছুর, কিন্তু উপায় এত অল্প যে, আমাদের মন্ত্রীরা জনসাধারণের ভালো করতে চাইলেও তাদের অবস্থার পরিবর্তন করা ততো সহজ নয়।

সরকারের যে আয়, তার এক তৃতীয়াংশ আসে আবগারি থেকে। অনেক বছর ধরে কংগ্রেস এই আয়ের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালিয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে আবগারি থেকে আয়কে বন্ধ করার মধ্যে ব্যবহারিক নীতিজ্ঞানের কোনো পরিচয় নেই। রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের কাজে এ আয়ও যথেষ্ট নয়। সুতরাং আয়ের ব্যাপারে নতুনভাবে চিন্তা করা দরকার। যদি সরকার বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন নিজের হাতে নেন, যেমন সিগারেট তৈরি সরকার অধিগ্রহণ করলে আয় বৃদ্ধি পাবে। ইউরোপের অনেক দেশে সিগারেটের ওপর বিশেষ কর চালু করা হয়েছে। আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত জাপান, কারণ সেখানে সিগারেট তৈরির সমস্ত ব্যবস্থা সরকারের হাতে। বিহারেও আমরা সেই কাজ করতে পারি। এখানে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। এ-ব্যবসা সরকারের অধিগ্রহণ করা উচিত। এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলিকে এ-ধরনের কারখানায় কাজ দিয়ে সরকার তাদের সহযোগিতা করতে পারেন। মূল কথা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ শিল্পোদ্যোগে হরিজনদের বেশি বেশি করে কাজ দিয়ে তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সরকার সহায়তা করুন।

খেতমজুর

যখন থেকে কৃষক-আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে, তখন থেকে কৃষকদের শক্তিকে দুর্বল করার জন্যে জমিদার শ্রেণীকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। বিশেষ করে গত নির্বাচনের পরে, যখন তারা দেখল শাসন ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে, আর সে শাসনক্ষমতা কৃষকদের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তখন থেকে তারা আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিভেদ-নীতি সবচেয়ে সহজ এবং ফলপ্রসূ। এই বিভেদ-নীতির ওপর দাঁড়িয়েই জমিদাররা খেতমজুর আন্দোলনকে তেমনি জোরদার করতে চায়, যেমন গত নির্বাচনে তারা ত্রিবেণী সংঘের পরামর্শে এবং বিশেষ করে টাকার জোরে খেতমজুর আন্দোলনকে মদত জুগিয়েছিল। সে সময় তারা সফল হয়নি, কিন্তু এখন তারা গোপনে মদত দিয়ে খেতমজুর সংগঠনকে দাঁড় করানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। জমিদাররা খেতমজুরদের জন্যে বেশ টাকা খরচ করছে এবং করবে। এখন—এই মুহূর্তে খেতমজুরদের দুটি সংগঠন তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেদিনই আমার মাথা ঘুরে যায়, যেদিন দেখি জমিদারদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু'জন ভদ্রলোক তাদের ভোট দেয়ার জন্যে কাজ করেছে, তারাই এখন খেতমজুর সংগঠনের ঝাণ্ডা তুলে ধরেছে। আমি বলছি না, খেতমজুরদের কোনো কষ্ট নেই, তাদের অভিযোগ মিথ্যা, তাদের অপমানিত-জীবন কাটাতে হয় না; কিন্তু আমাদের দেখতে হবে, আমরা আমাদের কাজে কিভাবে সফলতা অর্জনে সমর্থ হব? জমিদাররা শুধু কৃষক-স্বার্থেরই বিরোধী নয়, খেতমজুরদেরও তারা বিপক্ষে। খেতমজুররা যদি শ্রমিক হিসেবে থাকতে চায় তাহলে তাদের মজুরি বৃদ্ধি তখনই সম্ভব হবে, যখন কৃষকদের আয় বাড়বে। তারা যদি কৃষক হতে চায়, তাহলে দেখতে হবে তাদের জন্যে কিভাবে জমির ব্যবস্থা করা যেতে পারে? যে কৃষকদের কাছে দু-চার বিঘের বেশি জমি নেই, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, সেক্ষেত্রে তারা খেত-মজুরদের কোথা থেকে জমি দেবে? আমি তো এভাবেই বুঝি, কৃষকদেরও আর্থিক অবস্থা স্রেফ জমিদারদের হটিয়ে দিলেই সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হবে না। কৃষিকার্যে তাদের নতুন কলাকৌশল, ছোট ছোট মেশিন এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। খেতমজুররা যদি কিষাণ হতে চায়, তাহলে স্রেফ একটিই উপায় আছে, তা হচ্ছে জমিদারদের কাছে যত ওয়াকাস্ত বা জিরাত-জমি আছে তা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা এবং বিহারের পালামৌ, রাঁচী, হাজারীবাগ ইত্যাদি জেলায় চাষের উপযোগী পড়ে থাকা জমি (পতিত এবং জঙ্গল) খেতমজুর-দের জন্যে সংরক্ষিত করা। আমি মনে করি, খেতমজুররা এক বিরাট ভুল করবে, যদি এই মুহূর্তে যা হওয়া সম্ভব, তা না করে কৃষকদের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করে।

বিহারে খেতমজুরদের যে আন্দোলন চলছে, তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে কিছু হরিজন নেতাও আছেন। এইসব হরিজন ভাইদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, খেতমজুর সংগঠনের নামে নিজেদের সংগঠন করে, হরিজন ভাইরা (এ-শব্দ ব্যবহার করতে আমি ভীষণ ঘৃণা বোধ করি। কিন্তু নিজের অর্থ সুস্পষ্ট করার জন্যে এ-শব্দ ব্যবহার করছি) ভুল করছে। তাদের একান্তভাবে নিজেদেরই একটি সংগঠন দরকার। কারণ তাদের সমস্যা খুবই প্রকট এবং সামাজিক, ধার্মিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত। কাজেই তাদের সংগঠনে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলকেই যদি স্থান দেয়, তাহলে সত্যিকারের অস্পৃশ্যরা (হরিজন) হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। যেখানে যা কিছু পতিত ওয়াকাস্ত, জিরাত এবং জঙ্গলের জমি পাওয়া যাবে, তা সবই খেতমজুরদের এই সংগঠনকে দিলে, তার পরিণাম হবে, ছুত (স্পৃশ্য) সম্প্রদায়, যারা খুব সহজেই উচ্চপদস্থ অফিসারদের কাছে যেতে পারবে, তারা সে জমি হাতিয়ে নেবে। আর হরিজনরা খুব কম পরিমাণ জমি পাবে। স্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত খেতমজুরদের অবস্থা অস্পৃশ্য জাতিগুলির মতো অত হীন এবং অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত নয়। স্পৃশ্য জাতিরা পানের দোকান খুলতে পারে, হালুইকর হতে পারে, হোটেল চালাতে পারে এবং আরও নানান ধরনের কাজ করতে পারে। প্রাইভেট চাকরিও তারা সহজে পেতে পারে, কিন্তু যারা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত তাদের পক্ষে তা করা বা পাওয়া সম্ভব নয়। অস্পৃশ্য জাতিগুলির ওপর যে অত্যাচার চলে আসছে, তার কারণ, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাদের উচিত, সমস্ত শক্তি এমনভাবে নিয়োজিত করা যাতে তারা শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির অন্য উপায় গ্রহণ করে, নিজেদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পথের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূর করতে পারে। এরকম একটা সময়ে কিষাণদের অত্যাচার নিয়ে লড়াই-ঝগড়া সৃষ্টি করলে নিজেদের শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে।

খেতমজুরদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাম্যবাদেই সম্ভব। আর এখন যে বিপ্লব শুরু হয়েছে তা সাম্যবাদে পৌঁছে থামবে। সাম্যবাদ ছাড়া তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের অন্য কোনো দ্বিতীয় পথ নেই। সারণ আর মুজফ্‌ফরপুরের মতো জেলার মানুষদের মাথা পিছু ছ'সাত কাঠা জমি পড়ে। বলুন, এই সামান্য জমি দিয়ে তারা কীভাবে জীবন নির্বাহ করবে? চার-পাঁচ কাঠা আয়তনের ছোট ছোট খেতে কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ সম্ভব? আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে জমিদারী প্রথার বিলোপ ও জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে রাষ্ট্রীয়করণ করলে। গ্রামের সমস্ত খেতের আল ভেঙে একটি অখণ্ড খেতে পরিণত করে ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ করতে হবে। সবাইকে একত্রিত হয়ে সার্বজনিক খেতে নানাবিধ

নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা তথা কৃষির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। তাহলেই আমরা জাপানের মতো বিঘা প্রতি জমিতে সাত-আটশো টাকার ফসল উৎপাদন করতে পারব। আর যদি দু-একটা জেলায় খরা বা বন্যাও হয়, তাহলে অন্য জেলার উৎপাদিত শস্য আমাদের অনাহার থেকে বাঁচাবে। খরা এবং বন্যা এমন জিনিস নয় যে, এতে মানুষ গৃহহীন হবে এবং অনাহারে প্রাণ হারাবে। বিহারে তিন কোটি মানুষ বাস করে। এর মধ্যে দু' কোটি মানুষ অবশ্যই শারীরিক শ্রম করতে সক্ষম। এই অজস্র হাতগুলি যদি গৃহ নির্মাণ এবং গ্রাম গড়ে তোলার কাজে একমাসের জন্যেও নেমে পড়ে, তাহলে কি তারা উঁচু জায়গায় ঘর বানিয়ে থাকতে পারবে না? মানুষের শ্রমই তো সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে, আর বাদ বাকি সমস্ত সামগ্রী তো আমাদের এই প্রদেশেই মজুদ আছে। সুতরাং পুরানো পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করলেও এখানে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে তাতে বিহারের মানুষ এক বছরেরও বেশি খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে পারবে। এক জায়গার মানুষের উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রি করা এবং বাইরে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছে, আর অন্য জায়গার মানুষ না খেয়ে মরছে। অথচ অন্য জায়গার লোক তার শ্রম দিতে প্রস্তুত, সুতরাং কি এমন কারণ ঘটছে যে এক জায়গার মানুষ না খেয়ে মরবে? সাম্যবাদই আমাদের শিখিয়ে দেবে, আমাদের দু-একজনের ঘরের প্রয়োজন নেই, আমাদের সাড়ে তিনকোটি মানুষের জন্যে একটি ঘর তৈরি করতে হবে। আর সমস্ত হাত এবং মস্তিষ্কগুলিকে এইসব পরিবারগুলির জীবিকা, ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্যে-কাজে লাগাতে হবে। বিপ্লবের পথে কোনো প্রতিবন্ধক যেন আমাদের আটকাতে না পারে, আর খেতমজুরদের যদি কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে তা বিপ্লবের সম্পূর্ণ সাফল্যের মধ্যেই নিহিত আছে। তাদের জানা দরকার, যে-সাম্যবাদীরা বর্তমানে কৃষকদের সংগঠিত করছেন, তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করছেন, তাঁরা জানেন শুধু জমিদারী প্রথা তুলে দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না—পরবর্তী সময়ে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বকেও লোপ করতে হবে—অর্থাৎ কৃষক, খেতমজুর সবাই খেতের মালিক হবে। শুধু জমি চাষ করে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না, আমাদের দেশে কলকারখানা স্থাপন করতে হবে, আর এর ফলেই আমাদের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য দূর হবে। বিপ্লবকে সামনে এগিয়ে যেতে দাও—আর এই বিপ্লবই হবে খেতমজুরদের কাম্য।

রাশিয়াতে আড়াই মাস

'আমি সব শুদ্ধ সাড়ে চার মাস দেশের বাইরে ছিলাম'—রাশিয়ায় যাওয়ার পথে দেড় মাস ইরানে, ফেরার পথে দু'সপ্তাহ আফগানিস্তানে এবং আড়াই মাস রাশিয়াতে ছিলাম। গিয়েছি বোলান পাস দিয়ে, আর ফিরেছি খাইবার পাস দিয়ে। ভারতবর্ষ এবং রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে ট্রেন পেয়েছি, ইরান এবং আফগানিস্তানে গিয়েছি মোটরে, আর কাস্পিয়ান সাগর পাড়ি দিয়েছি জাহাজে। ১২ নভেম্বর সোভিয়েত সীমানা অতিক্রম করি, ২৬ জানুয়ারি সেখান থেকে প্রস্থান করি। কাজেই রাশিয়ার শীত অনুভব করার সুযোগ হয়েছে। ককেশাস এবং মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল ছাড়া সমস্ত জায়গা বরফে আচ্ছাদিত ছিল। চাষ-আবাদ শুধু ঐ অঞ্চলেই হতে দেখেছি।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে ভুল ধারণা বহুদিন পর্যন্ত প্রচারিত হতে থাকবে। সারা পৃথিবীর পত্র-পত্রিকাগুলি গলা ফাটিয়ে তার ব্যর্থতার কথা প্রচার করলেও আসলে সাম্যবাদের প্রভাব সারা দুনিয়াতে এত দ্রুত বাড়ছে যে, পুঁজিবাদী দুনিয়াও যদি সোভিয়েতে সাম্যবাদের সাফল্যের কথা বলে, তাহলে তার নিজের গতি কি হবে? সোভিয়েত থেকে অনেক দূর-দেশগুলির কথা ছেড়েই দিন। রাশিয়া এবং আফগানিস্তানের সীমান্ত নির্ধারণ করছে বক্ষু (আমু) নদী। আমি আফগানিস্তানের বহু মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলতে শুনেছি, —'রাশিয়ার কৃষকদের খাবার জোটে না।' তারা জানে না, বিংশ শতাব্দীতে ১৯১৩ সালে রাশিয়াতে খুব ভালো ফলন হয়। ১৯৩৭ সালে রাশিয়াতে যে গম উৎপাদন হয়, তা ১৯১৩ সালের উৎপাদিত ফসলের দ্বিগুণ। ১৯৩০-৩১ সালে ধনী কৃষকদের স্বার্থপরতা এবং মিথ্যা প্রচারের জন্যে চাষ আবাদ কম হয় এবং নির্বিচারে গরু মোষ ভেড়া মেরে ফেলায় আকাল দেখা দেয়। সে সময় কিছু 'কুলাক' (ধনী কিষাণ) সোভিয়েত থেকে পালিয়ে আফগানিস্তানে আশ্রয় নেয়। ১৯৩০-৩১ ও বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থার মধ্যে জমিন-আসমান ফারাক। তবুও সোভিয়েত সীমান্তের এপারে আফগানের মানুষদের কাছে সোভিয়েত রাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত 'আকাল' চলছে।

সোভিয়েতে মানুষের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতির মান প্রতি বছর কেন, প্রতি মাসে উন্নত হচ্ছে। প্রতি বছর শ্রমিক-কর্মচারীদের পাঁচ, দশ এবং পনেরো শতাংশ বেতন বৃদ্ধি ঘটছে। বিভিন্ন জিনিসের উপযোগিতা অনুযায়ী কল-কারখানার সংখ্যা এবং কর্মকর্তাদের কাজের কুশলতাও যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দামও কমানো হচ্ছে। বেতন দেয়া এবং বিক্রয় ব্যবস্থা সরকারের হাতে। গত দু'বছরে নানা ধরনের খাদ্যসামগ্রীর দাম পঁচিশ থেকে

তিরিশ শতাংশ কমে গিয়েছে। আমি সেখানে যখন ছিলাম, তখন হাসপাতালের নার্সদের মাইনে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে বেতন বৃদ্ধি এবং জিনিস-পত্রের দাম কমানোর জন্যে মানুষ জীবনের ভোগ সামগ্রী অনেক বেশি পাচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত সেখানে ৫-৬ বছর ধরে কোনো বেকারি নেই। কর্মক্ষম লোকের সেখানে কাজের কোনো অভাব নেই। অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে অসমর্থ হয়ে পড়লে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব সরকার নিয়ে নেয়। সে-জন্যে সেখানে মানুষের 'আগামীকালের জন্যে কোনো চিন্তা' একেবারেই নেই। এ-কথা ঠিকই, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার শ্রমিকরা রাশিয়ার অনেক শ্রমিকের চেয়ে বেশি মজুরি পায়, কিন্তু সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর মাথার ওপর সর্বক্ষণ বেকারির খাঁড়া ঝুলছে, কিন্তু সোভিয়েত শ্রমজীবীরা 'আগামী কালের' জন্যে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতনও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নতুন সংবিধান অনুসারে ১২ ডিসেম্বর সোভিয়েত মহাসঙ্ঘে যে ১১৪৩ জন-প্রতিনিধি (deputies) নির্বাচিত হয়েছে, সেই নির্বাচনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে পুঁজিবাদী দেশগুলি খুব চেষ্টা করে এবং এখনও করছে। কেউ বলছে, 'এ নির্বাচন নয়, স্রেফ প্রহসন'। কেউ বলছে, 'স্তালিন এবং কমিউনিস্ট পার্টির লোকরা ভয় দেখিয়ে ভোট নিয়েছে।' নতুন সংবিধান কতখানি জনগণতান্ত্রিক আর ভোট প্রদানের জন্যে মানুষকে কতটা স্বাধীনতা প্রদান করেছে, তা নিচের বক্তব্য থেকেই বোঝা যাবে—

১. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৩৭-এর পূর্বে পুরানো জমিদার, পুঁজিপতি, ধর্মজাযক, কুলাক (ধনী কৃষক) এবং বিপ্লববিরোধীদের সন্তান-সন্ততিদের ভোট দেয়ার অধিকার ছিল না। নতুন সংবিধান ১৮ বছরের ওপরে সমস্ত পুরুষ এবং নারীকে ভোটাধিকার দিয়েছে। ধন-সম্পদ এবং শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে এই ভোটাধিকারের মান নির্ধারণ করা হয়নি।

২. প্রত্যেক ভোটার যাতে গোপন-ব্যালটে ছাপ মেরে ভোট দিতে পারে তার ব্যবস্থা আছে। ভোটদাতা কাকে ভোট দিচ্ছে একমাত্র সে-ই জানবে।

৩. ৫১ শতাংশ ভোট না পেলে, সংসদ-সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া যায় না।

৪. ভোটার তালিকায় নাম তোলার ভার ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির মতো সংগঠন বা কোনো সর্বজনীন সংস্থার ওপর দেওয়া হয়েছে। কারণ সোভিয়েতে কোনো ব্যক্তি এমন কোনো সম্পত্তির অধিকারি নয়, যার জোরে সে নির্বাচনের প্রচারে নামতে পারে, বা বিরাট সভা সংগঠিত করতে পারে। নির্বাচনের সমস্ত ব্যয়ভার ব্যক্তির নয় সংগঠনের। সে-জন্যে ভোটার তালিকা তৈরি করার ভারও তাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

সোভিয়েতে এমন কোনো নিয়ম নেই যে, এক নির্বাচন ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর

বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রার্থীকে দাঁড় করানো যাবে না। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তার সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এমন এক জনপ্রিয় পার্টি হয়ে উঠেছে যে, নিজের পরাজয় নিশ্চিত জেনে তার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের পুনর্নির্বাচনে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে যেমন কেউ দাঁড়াতে সাহস করেনি, তেমনি সোভিয়েতেও অন্য কোনো প্রার্থী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করে না।

সোভিয়েত এবং স্তালিনের বিরুদ্ধে অজস্র মিথ্যা প্রচার করা হয় এবং ট্রটস্কি ছাড়া আর কোনো যোগ্য নেতা নেই এই লম্বা-চওড়া প্রচার পুঁজিবাদী পত্র-পত্রিকাগুলির ধর্ম হয়ে উঠেছে। ট্রটস্কির প্রশংসা এবং সাম্যবাদ সম্পর্কে তার যে নিষ্ঠা তা এমনভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে, যেন পুঁজিবাদী সাংবাদিকরা দুনিয়াতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে ভীষণভাবে আগ্রহী। সোভিয়েত সাম্যবাদের সফলতা পৃথিবীর বুকে একটি অসাধারণ সফলতার সার্থক উদাহরণ। তাই তারা মানুষের মন থেকে তা মুছে দিতে চায়। সে-জন্যে তারা সোভিয়েত বিরোধী এবং স্তালিন বিরোধী চিন্তা-ভাবনার মানুষকে সামনের সারিতে আনতে চাইছে। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা এবং সোভিয়েতের প্রধান নেতা স্তালিন যে কত জনপ্রিয়, তা আমরা গত ১২ ডিসেম্বরে দেখি, যখন প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে দুনিয়ার এক ষষ্টাংশ অধ্যুষিত এই বিশাল দেশের ৯৬ শতাংশ মানুষ কষ্ট স্বীকার করেও ভোট দিতে এসেছিল; গত দশ বছরে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ইত্যাদি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে ৮৩ শতাংশের বেশি মানুষ ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রে হাজির হয়নি। স্তালিনের নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের একজনও সেদিন অনুপস্থিত থাকেনি। স্তালিনের কথাকে তারা শিরোধার্য করে রাখে। কার্ল মার্কস সাম্যবাদী তত্ত্বের দ্রষ্টা, তিনি সত্যকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা, আর্থিক দুর্দশার কারণকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সামনে উপস্থিত করেছেন। কত অসংখ্য চিন্তাশীল মানুষই না এই সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু পুঁজিবাদীদের স্বার্থে এবং সেই স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যে তাদের হাতে যে শক্তিশালী উপায়গুলি আছে, তা ছিল বিশ্বে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। লেনিনের বৈশিষ্ট্য ছিল, বিশ্বে সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করা, সে-কাজে কতবারই না তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। যাইহোক, সাম্যবাদী বিপ্লব জারের সাম্রাজ্যেই সংঘটিত হয়। দেশের এবং বিদেশের পুঁজিপতিরা সেই বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্যে সব রকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কিন্তু লেনিন বেঁচে থাকাকালীন উৎপাদনের খুব অল্প উপকরণই ব্যক্তির হাত থেকে সমাজের হাতে এসেছিল, শুধু চাষ-আবাদ নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যও বেশ কিছু ব্যক্তির হাতে ছিল। ১৯২৪-এর প্রারম্ভেই লেনিনের মৃত্যু হয়। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত—প্রতিটি মানুষকে সাম্যবাদী

সমাজের একজন করে গড়ে তোলার কাজ স্তালিনই করেছেন। এ-কাজ মার্কস এবং লেনিনের কাজ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেনিনের মৃত্যুর পর, স্তালিনই কলকারখানার বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। একদিকে বুখারিনের মতো নরমপন্থীরা বললেন, শিল্পায়ন খুব দ্রুত করা হচ্ছে, এ শিল্পায়ন সফল হবে না, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে ট্রটস্কির মতো চরমপন্থীদের বক্তব্য ছিল, সারা দুনিয়ার বিপ্লব ছাড়া, একটা দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সেজন্যে আমাদের সমস্ত শক্তি রাশিয়াতে সাম্যবাদকে দৃঢ়তর করা এবং শিল্পায়নের কাজে নিয়োজিত না করে, বিশ্ববিপ্লবের জন্যে নিয়োজিত করা উচিত। এই প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও স্তালিন তাঁর কর্মসূচিকে জনসাধারণের সামনে রাখেন আর তাতে তিনি সফলতাও লাভ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়েও পার্টির দক্ষিণ এবং বামপন্থীরা এইভাবেই বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু সোভিয়েত জনসাধারণ তাদের নিজের চোখেই এই পরিকল্পনার আশাতীত আর্থিক সাফল্য প্রত্যক্ষ করেছে। স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প ১৯২৭-এর বিশ্বযুদ্ধের আগেকার অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরীকল্পনা সমাপ্ত হওয়ার পর রাশিয়া ইউরোপের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র চাইছিল, আমেরিকার শিল্পোদ্যোগকে পেছনে ফেলে সে বিশ্বের প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ায়। এই পরিকল্পনার প্রথম বছরগুলিতে লোকে ঠাট্টা-তামাশা করত, আর এখন সাফল্য অর্জন করার পর প্রতিটি দেশ সোভিয়েতের অনুকরণ করতে চাইছে। এই পরিকল্পনা সফল করে সোভিয়েত জনগণ তাদের খিদে এবং বেকারির জায়গায় সুখ এবং সমৃদ্ধির দিন এনেছে। অশিক্ষা এবং নিরক্ষরতার জায়গায় জ্ঞান এবং শিল্পসংস্কৃতি ব্যাপক মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করছে। আজ থেকে দশ বছর আগে তাদের কিরকম হীন অবস্থা ছিল, তা অধিকাংশ সোভিয়েত জনগণ জানেন। স্তালিনের পরিকল্পনার সাফল্য হচ্ছে, তিনি এই পরিকল্পনাগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। কোনো কোনো মানুষের কাছে এই লোকপ্রিয়তা উপলব্ধি করা খুব মুশকিল। কারণ তারা মনে করে তিনি এমন একজন মানুষ যিনি ঈশ্বর-প্রেরিতপুরুষও নন, এমন কি তিনি ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্নও নন, তাহলে কেমন করে তিনি এত জনপ্রিয় হলেন।

বহু ষড়যন্ত্রকারীদেরই সোভিয়েত সরকার সাজা দিয়েছে, আর সেই সাজার খবর পুঁজিবাদী পত্রপত্রিকাগুলি সারা বিশ্বে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে পরিবেষণ করেছে —সোভিয়েত শাসনব্যবস্থার ভিত খুবই দুর্বল, হিংসা এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শাসন চালাচ্ছে। ভরোশিলভ, মলোতভ, বুদয়ন্নী ব্লুচরের মতো বিপ্লবীদের আগের মতো মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে দেখেও, পুরানো দু-চারজন বিপ্লবী

যারা অপরাধের জন্যে দণ্ডিত হয়েছে, তাদের হয়ে পুঁজিবাদী পত্রিকাগুলি হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে। বলছে, 'লেনিনের সমস্ত বিপ্লবী কমরেড স্তালিনের শিকার হয়েছে।' যারা দণ্ডিত হয়েছে, তাদের দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখব তারা এমন সব বুদ্ধিজীবী, যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার জন্যে পার্টি এবং তার যোগ্য নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করত। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা যতই উদার এবং ত্যাগী হোক না কেন, যদি তাদের স্বার্থ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘা খায় তাহলে তারা এত নিচে নামতে পারে যে, অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষেও অত নিচে নামা সম্ভব নয়। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে শিল্প-বাণিজ্য এত বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং প্রযুক্তি এত ব্যবহৃত হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হলে রাষ্ট্রের অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করতে পারে। একটি বিশেষ যন্ত্রকে খারাপ করে দিয়ে দশজনের কাজ বন্ধ করে দিতে পারে। রেল চলাচলের সময়-সূচিতে বিভ্রান্তি ঘটিয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। খনির গভীরে পাম্পের ব্যবস্থা নষ্ট করে দিয়ে খনিতে প্লাবন ঘটাতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তিকে সোভিয়েত সরকার সম্প্রতি কঠোর দণ্ড দিয়েছেন, তারা এ-সব অপরাধই সংঘটিত করেছে। তাদের জন্যে জনসাধারণের কোনো সহানুভূতি নেই। যদি তাদের গ্রেফতার করে জেলে বন্দী করা না হতো, মানুষ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আমেরিকার সাদা মানুষদের মতো তাদের লিংচিং করে মেরে ফেলত। এই সব মানুষদের সোভিয়েত শাসন এবং স্তালিনের জুলুমে "শহীদ' আখ্যায় ভূষিত করার মধ্যে বিদেশী পুঁজিবাদীদের কায়েমি স্বার্থ আছে। আর এভাবে সত্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা হিসেবে প্রতিপন্ন করার কাজ ততদিন চলবে, যতদিন সোভিয়েত এক ভয়নাক যুদ্ধে তার শক্তির প্রমাণ না দিচ্ছে। হয়তো তার পরেও, যতদিন পুঁজিবাদ এই বিশ্বে তার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবে, তারা কি এই মিথ্যা প্রচার বন্ধ করবে?

অন্যান্য প্রবন্ধ

আমি কি করে গল্প লেখক হলাম

কাহিনী-লেখক, বা আদৌ লেখক কি করে হয়ে উঠলাম—বলা বড় মুশকিল। প্রথমে আমার মনে লেখক হয়ে ওঠবার কোনো বাসনা বা খেয়ালই হয়নি। যখন আমি নিজামাবাদ অর্থাৎ আজমগড়ে উর্দু মিডিল স্কুলের ছাত্র, তখন রশ্মি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল। আমার অধ্যাপক আমাকে একটা বিষয় দিতেন আর আমি ছাত্র হিসেবে দুই-তিন পৃষ্ঠা লিখে নিয়ে যেতাম। আমার লেখা নিয়ে আমার নিজের কোনো অহঙ্কার ছিল না। অধ্যাপকের তারিফ করাকেও কোনো গুরুত্ব দিইনি। আমি কিছু কিছু নক্‌শাও বানাতে পারতাম। নক্‌শা বানিয়ে তাতে লাল রঙ ভরে দিতাম। আমি নিশ্চিত জানতাম তার মধ্যে অনেক গলদ আছে, তাই সেগুলি নিয়েও আমার কোনো অহঙ্কার ছিল না। কিন্তু আমার অধ্যাপক বাবু জগন্নাথ রায় তারিফ না করে থাকতে পারতেন না, অন্য ছাত্রদের সামনে আমার নক্‌শা পেশ করে বলতেন, এই হলো আদর্শ। আমার মনে কেবল একটা মজার ভাব জাগত। সেই সময়ে আমার বরং বাসনা ছিল, কি করে আরও জ্ঞানার্জন করা যায়, কি করে পরিব্রাজক হওয়া যায়। লেখক হবার সম্ভাবনা ছিল ; নানা ঘটনার যোগাযোগে লেখক বনে গেলাম। যাত্রীরা পথে বেরোবার আগেই কিছু জানতে চায়, আর সব পরিব্রাজকই জিজ্ঞাসা পূরণ করতে কিছু না কিছু বলে থাকে। এরকম কিছু কথা তো গোড়াতেই আমার জারি করা হয় গেছে। ১৯১৫ সালে যখন আমি আগ্রায় ছিলাম, তখন অপরের জবরদস্তিতে কলম ধরতে হয়েছিল। ওখানে তো উপদেশক হয়ে পড়েছিলাম, আর আমার ব্যাখ্যান এবং শাস্ত্রার্থ তখন তো আমার শিক্ষারই অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল। আমার শিক্ষক ওটার মালিক ছিলেন না, সভা-সমিতিতে উনি কিছু কিছু বক্তৃতা দিতেন। ওখান থেকে একটা উর্দু পত্রিকা বেরোতো। তাতে আমায় সমাজের পক্ষ নিয়ে খণ্ডন খণ্ডন শীর্ষকে কিছু লেখার জন্য বলা হয়। তাতে উৎসাহিত হয়ে আমি বলেছিলাম, আরো একটু অগ্রসর হন। আমার ঠিক জানা ছিল না যারা আমার সহপাঠী—মিডিল পাশ বা ফেল করা, যাইহোক, একজনেরও লেখা হিন্দী পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল কিনা। ১৯১৫ সালে আমার প্রথম লেখা হিন্দী প্রবন্ধ—সেটা আধা-গল্প, আধা-ভ্রমণ ধরনের ছিল। অধিকাংশ যাত্রা-বর্ণনা যেমন হয়। সাঁইত্রিশ বছর হয়ে গেছে। এখনো সে লেখাটির দেখা পাইনি। মীরাট থেকে প্রকাশিত ছোটদের মাসিকপত্র 'ভাস্কর'-এ ছাপা হয়েছিল। প্রথম লেখা ছাপা হতে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল।

১৯১৫ সালের পর অনেক বছর কেটে গেছে। আমার হিন্দী লেখ-চর্চায়

বিরতি। ঐ সময় আমার পথ প্রদর্শক এবং আরবি ভাষার গুরুভাই মহেশ প্রসাদ (মৌলভী ফাজিল) নানা পত্র-পত্রিকায় ঐতিহাসিক গল্প লিখতেন। আমার সংস্কৃত আর হিন্দীতে যোগ্যতার জন্য আমি তাঁকে কিছু কিছু সহায়তা করেছি। কিন্তু নিজে লিখিনি। চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত আমি লাহোরে উর্দু পত্রিকায় আর্যসমাজী হিসেবে অবশ্য কিছু লিখেছি, কিন্তু ১৯২০ সালে জালন্ধর কন্যা বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' পত্রিকায় হিন্দীতে লিখেছি। ঐ লেখাগুলি কুশীনগর, লুম্বিনী, জেতবন-শ্রাবস্তী বৈশালী, নালন্দা-রাজগীরের বৌদ্ধ তীর্থে ভ্রমণের কাহিনী। ভ্রমণ কাহিনী লিখতে গিয়ে দেখলাম, কিছু না কিছু সৃষ্টি হচ্ছে।

১৯২১ অসহযোগ আন্দোলনের রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করতে লাগলাম। আমার কার্যক্ষেত্র ছিল বিহারের ছাপড়া জেলা। তখন কছু লিখতে ইচ্ছা হতো না, প্রয়োজনও ছিল না, আমার হিন্দী যদিও তখন বেশ সহজ সরল হয়ে এসেছে। কিন্তু আমার মনে পড়ে না—যতদিন ছাপড়ায় আমি কাজকর্ম করেছি, ততদিন ভোজপুরী ছেড়ে হিন্দীতে আমি কিছু বলেছি। ১৯২১ সালের শেষে আমার শাস্তি হলো। ছ'মাসের জন্যে জেলে গেলাম। জেলে লেখাপড়ার সময় পাওয়া গেলো। আবার কলম ধরলাম। জেলের অভিজ্ঞতাই প্রথম প্রথম লিখতে লাগলাম। কাহিনী রচনা করা মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। যেমন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে আগে লেখা শুরু করেছিলাম, সে-রকমই ১৯১৮, ১৯১৯ সালে রুশ বিপ্লবের কাহিনী কিছু কমিয়ে বাড়িয়ে তখনকার হিন্দী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো, তার সঙ্গে কল্পনার নুন-মরিচ মিশিয়ে নিজের মনেই এক সাম্যবাদী দুনিয়া সৃষ্টি করে নিয়েছিলাম। সেই দুনিয়ার কথা কাগজে-কলমে লেখার বসানা হলো। আমার যথার্থ সাম্যবাদের কিছু জ্ঞান ছিল না। তখনও আমি মার্কসের নামও শুনিনি। আমার সাম্যবাদ ছিল ইউটোপীয় (কাল্পনিক), এর ব্যবহারিক কঠিনতা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এখনও আমি বুঝতে পারি না যে সাধারণ মজুর আর কৃষাণ—যারা সাম্যবাদের বাহক তারা তো আজও নিরক্ষর। ভারতে কি রকম সাম্যবাদ স্থাপিত হবে তা সংস্কৃত শ্লোকে লেখাই শুরু হয়েছিল। ছ'মাস যখন জেলে তখনও সর্বক্ষণ সংস্কৃত রচনায় নিবিষ্ট হতে পারিনি। জেলের সাথীরা কেউ উপনিষদ কেউ অন্য বই পড়তেন। সুতরাং সময় বেশি পাইনি। এ-ধরনের সংস্কৃত লেখার কাজ দু'-চারদিন চলার পর বন্ধ হয়ে গেল। ১৯২২ সালের জুন বা জুলাইতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে এলাম। ছ'মাস আবার কংগ্রেসের কাজে ব্যস্ত, পাটনায় ছিল প্রান্তীয় কংগ্রেস কমিটির বৈঠক, গোলাপবাগে হলো এক সর্বজনীন সভা। চৌরিচৌরার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে কয়েকজন স্বদেশবাসীর ফাঁসি হলো। একান্ত অহিংসার রাজনীতির আদর্শে আমার কখনোই বিশ্বাস ছিল না। তাই

চৌরিচৌরার ঘটনায় দণ্ডিত দেশপ্রেমিকদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশ্য সভায় আমি খুব জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলাম।

এই ভাষণের পরে, দেড় মাসের জন্য আমি নেপাল যাত্রা করলাম। বোধহয় সময়টা ১৯২৩ ফেব্রুয়ারি, মার্চ হবে। ছাপড়া জেলার বন্ধুরা আমার সুবিধার জন্য নেপালে চিঠি দিয়েছিল। সে চিঠি পৌছায়নি। না হলে নেপাল থেকে তিব্বত যাবার এত আকর্ষণ—এমনকি নিমন্ত্রণও পেয়েছি। ফিরে এসেই আবার গ্রেফতার হলাম। আমি অপরাধ স্বীকার করলাম। ১৯২৩ থেকে ১৯২৫—দু'বছর পাটনায় জেলবাস করলাম। জেল-জীবনে আমি যথেষ্ট কলম চালনা করেছি। যদিও জেলে লেখা বা অনূদিত বারো-তেরোটি বইয়ের মধ্যে সবগুলি প্রকাশিত হয়নি। তবু লেখার কাজকেই এখন আমি আমার জীবনের কর্মক্ষেত্রেরই সামিল করে নিয়েছি। বক্সার জেলের কাহিনী নিয়েই মহাকাব্য ধরনের লেখাটা পাঁচ সর্গে পৌছিয়েছে। ওটার কোনো দাম নেই ধরে নিয়েই ওর বদলে হাজারীবাগে থাকতে লিখি 'বাইশবী সদী'। ওটাকে উপন্যাস বা বড়গল্প যাই বলুন ওটাই আমার প্রথম উপন্যাস বা কথাসাহিত্য। জেলে আমি চারটি ইংরেজি উপন্যাস তথা—'জাদুকা মুলুক', 'সোনেকি ঢাল', 'বিস্মৃতি কে গর্ভমে', 'শয়তানকি আঁখে'-র ভাবানুবাদ করতে গিয়ে ভৌগোলিক এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারের অনেক কিছু ভারতীয় করণ করে নিয়েছিলাম। এই কাজ নিষ্কাম ভাব নিয়েই করেছিলাম। কখনও ভাবিনি যে বইগুলো ছাপাখানার মুখ দেখবে। জেল থেকে যখন কেউ বাইরে যেত, তার হাত দিয়ে কিছু লেখা বাইরে পাঠিয়ে দিতাম। ভাবতাম যদি নষ্টও হয় তাতেও কিছু আসে যায় না। আমার অভ্যাসটা তো রয়ে গেল।

ভাই পরেশনাথ ত্রিপাঠী আমার সঙ্গে জেলে প্রায় এক বছর ছিলেন। তাঁকে ইংরেজি শেখানোর জন্য আমি হাজারীবাগের জেলার সাহেবের কাছ থেকে কিছু ইংরেজি উপন্যাস চেয়ে নিয়েছিলাম—আমারও কিছু ছিল। পড়তে পড়তে খেয়াল হলো যে, এরকম সাহসিকতাপূর্ণ উপন্যাস হিন্দীতে লেখা হলে খুবই ভালো হতো। আমি তাই হিন্দীতে একটা বই অনুবাদ করে ফেললাম। মূল লেখকের নাম মনে না থাকায় তা দিতে পারিনি, আর প্রকাশক বইটা সেই-ভাবেই ছেপেছিলেন। তাতে মনে হয় যেন বইটি আমার মৌলিক রচনা।

১৯২৫ জেল থেকে বেরিয়ে আবার কিছুকাল রাজনীতির কাজ, আর কিছু সময় পাঞ্জাব ও লাদাখ যাত্রায় কেটে গেলো। পাঞ্জাব-লাদাখ যাত্রার বিষয় নিয়ে কত কি-ই না লিখেছি। ভ্রমণ কথা আর কথাসাহিত্যের মধ্যে বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে। দেশ সম্বন্ধে লেখবার জন্যই আমার যাত্রী হওয়ার ঝোঁক। ১৯২৭ সালে ভারতভ্রমণ শেষ করে আমি সিংহলে গিয়ে দেড় বছর ছিলাম। ওখানেও সিংহল বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছি।

তিব্বতে প্রথম ভ্রমণ সেরেই ফিরে আসার পর বন্ধুরা ঐ বিষয়ে লিখতে বলেন। তারই পরিণাম 'তিব্বতে সওয়া বছর।' তার পরেও ১৯৩৮ পর্যন্ত ভ্রমণ চলতে লাগল। তার পরও আমি লিখেছি। যাত্রা অর্থাৎ ভ্রমণ বিষয়ে লিখতে লিখতে ১৯৩৪-৩৫ কিছু বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক কাহিনী লিখতে ইচ্ছা হয়। এক এক করে ঐ কাহিনীগুলি লিখে নানা পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই। সেগুলি 'সতমী কে বাচ্চে' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছিল। তার মধ্যে স্মৃতি জ্ঞানকীর্তির কথা পুরানো ইতিহাসের বিষয়, তিব্বতে থাকার সময়ে সংগ্রহ হয়েছিল। বাকি সব গল্পেরই চরিত্র আমার বাল্য কালের পরিচিত। এইভাবে 'বাইশবী সদী' এবং 'সতমী কে বাচ্চে' এবং আরো কিছু কাহিনী নিয়ে আমার হিন্দী কথাসাহিত্যে প্রবেশ।

১৯৩৮ কিষাণ আন্দোলনে জড়িত থাকায় ফের জেলে যেতে হলো। ওখানে যে অবসর পেলাম তাতেই আমার প্রথম উপন্যাস 'জীনে-কে-লিয়ে' লেখা হলো। এর মধ্যে বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিতে এক সংঘর্ষময় জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এর পরে আরো উপন্যাস লিখতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমার উপলব্ধি হলো যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাতে আমার হাত লাগানো উচিত। তার কারণ, এ ধরনের উপন্যাস লিখতে গেলে যে রকম ব্যাপক পরিচয় ও অধ্যয়ন আবশ্যক—হিন্দী উপন্যাস লেখকদের মধ্যে সে-রকম যোগ্যতা খুব কম লোকেরই আছে; আর দ্বিতীয় কারণ—অতীতের প্রগতিশীল প্রচেষ্টাকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করে তাদের হৃদয়ে আদর্শ-প্রেরণা সঞ্চার করা। আমার উপন্যাস কি গল্পে কতটা প্রচার বা প্রপাগাণ্ডা আছে, তা নিয়ে গভীর অন্বেষা নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমি তো উদ্দেশ্য নিয়েই লিখেছি—আদর্শের দ্বারা পাঠককে অনুপ্রাণিত করতে। আমার সামনে এই উদ্দেশ্য না থাকলে আমি উপন্যাস কি গল্প লিখতে যেতাম না। সেজন্যে আমার যে-সব বন্ধু আমার রচনায় কেবল প্রপাগাণ্ডা খুঁজে পান, তাঁদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

'জীনে-কে-লিয়ে' রচনার পর তিন-চার বছর আমি আর উপন্যাস বা গল্প লিখিনি। ১৯৩৩ ইউরোপ যাবার সময় আমার মনে হলো যে মার্কসবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে একটা এমন বই লিখতে হবে যাতে আমার দেশের ঐতিহাসিক বিকাশ সেই কাহিনীতে বিধৃত থাকবে। ১৯৪১ বা ১৯৪২ সাল, শ্রী ভগবতশরণ উপাধ্যায়ের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস আমি দেখেছি। যদি ভগবতশরণজী ঐ ধরনের ঐতিহাসিক কাহিনী লিখে প্রকাশিত করতে থাকতেন, তাহলে আমাকে 'ভোল্গা সে গঙ্গা' লিখতে হতো না। এখন অল্পই লেখা হয়েছে—ক'খণ্ডে কোথায় গিয়ে এই কাহিনী সমাপ্ত করব, তার ঠিক ঠিকানা পাচ্ছি না।

১৯৪২ সালে হাজারীবাগ জেলে থাকার সময় 'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'র কুড়িটি কাহিনী লিখে ফেলি। প্রথমে বিস্মৃত যাত্রী ('বিস্মৃত যাত্রী' উপন্যাস নামে ছাপা হয়েছে)—নামে মহান্ পর্যটক নরেন্দ্র যশের (৫১৮-৮২) শ্বেত উপত্যকা, সিংহল, মধ্য এশিয়া, বৈকাল সরোবর আর চীন দেশের জীবন নিয়ে কিছু লিখতে চেয়েছিলাম। তবে তার আগে বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখব।

আমার কাহিনীগুলির মধ্যে কোনটি সবার সেরা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। 'ভোল্‌গা সে গঙ্গা'র কাহিনী 'প্রভা' অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ, এসব শুনে শুনে আমারও মনে ঐ রকম ধারণা হয়েছে। নইলে এ-সংগ্রহের নাগদত্ত, প্রভা এবং সুরৈয়া—এই তিনটির মধ্যে আমি খুব একটা পার্থক্য দেখি না।

প্রেমচন্দ স্মৃতি

প্রথম জীবনে প্রেমচন্দ উর্দুতে লিখতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার কিছু আগে কানপুর থেকে প্রকাশিত 'জামানা' একটি উচ্চস্তরের মাসিক পত্রিকা বলে গণ্য হতো। ১৯১৫ সালের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে ঐ পত্রিকায় আমার প্রেমচন্দের নাম ও রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এর অনেক পরে। তখনই তিনি তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যের জন্য পাঠক সমাজের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর রচনার একটি বিশেষ গুণ ছিল, যেটাকে আবার সমসাময়িক হিন্দু এবং উর্দু লেখকেরা দোষ বলে মনে করতেন। প্রেমচন্দ ব্যক্তিগত জীবনে যে-রকম সাদা-সিধে ছিলেন, তাঁর রচানাশৈলীও ছিল সে রকম। তাঁর লেখাকে তিনি কখনোই কৃত্রিম সাজে সজ্জিত করতেন না। সাধারণ জনজীবন তাঁকে প্রভাবিত করত এবং সেখান থেকেই তিনি লেখার প্রেরণা পেতেন। তিনি সব সময় মনে করতেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি লিখছেন, সেই উদ্দেশ্যের সর্বোচ্চ প্রয়োগ যেন তাঁর লেখায় ঘটে এবং সে লেখা যেন অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌছায়, তিনি বহুজনের হিতের পক্ষে ছিলেন, তাই তাঁর লেখাও ছিল বহুজন হিতায় এবং সে জন্য ভাষাকে অযথা ভারাক্রান্ত করা, লেখার মধ্যে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য অন্য উর্দু লেখকদের অনুকরণ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তাঁর এই উদ্দেশ্যে তিনি বহুলাংশে সফল। সফলতা বলতে অবশ্য আমি আর্থিক সাফল্যকে বোঝাচ্ছি না, কারণ এ বিষয়টা ভারতীয় লেখকদের কাছ থেকে এখনও অনেক দূরে বলেই আমার ধারণা। তবে প্রেমচন্দজীর রচনার যে ব্যাপক সমাদর হয়েছে, তাকে সফলতা অবশ্যই বলা চলে।

এরপর ছ'বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে গোটা ভারতবর্ষ বার দুয়েক ঘোরা হয়ে গেছে। এ সময় (১৯২১ খৃঃ) অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে ছাপড়া জেলার গ্রামে গ্রামে ধুলো ঘেঁটে বেড়াচ্ছি। ওখানকারই একটি গ্রাম, নাম রেবতিয়া, সেখানে কয়েক দিন কাটাতে হয়েছিল। এখানেই প্রেমচন্দের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা পরিচয়। এবারেও সাক্ষাৎ নয়, পরিচয় তাঁর সাহিত্যকৃতির সঙ্গে। তবে এবারে তাঁকে জানলাম হিন্দী ভাষার সাহিত্যিক হিসেবে। যে পরিবারে আমি আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, তৎকালীন বিচারে তাকে খুব একটা শিক্ষিত পরিবার বলা চলে না। সে সময় সুশিক্ষিত পরিবার বলতে শুধুমাত্র ইংরেজি জানাটাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো না, বরং জীবন-যাপনে ইংরেজদের নকলনবিসিতে কে কত দড়, তার ওপর নির্ভর করত। বলা বাহুল্য এ-ধরনের শিক্ষিত পরিবার

হিন্দী বা উর্দুতে রুচি কমই রাখত। রেবতিয়ার মতো একটা গ্রামে প্রেমচন্দের দু'-একটি সাহিত্যকৃতি দেখে আমার মনে হলো যে প্রেমচন্দ হিন্দী ভাষার পাঠকদের এক নতুন এবং উচ্চ দিশার দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। রহস্য উপন্যাস, কিংবা ঐ ধরনের চটুল রচনার পাঠকের সংখ্যা হিন্দী ভাষায় তখনো প্রচুর। এই সমস্ত পাঠক ইংরেজি শিক্ষায় বঞ্চিত থাকায়, এবং অন্য কোনো রুচি সম্পন্ন সাহিত্যিক মনোরঞ্জনের সাধন না থাকায়, বাধ্য হতো ঐ সমস্ত হালকা চটুল রচনা পড়তে। সমস্ত অসহযোগ আন্দোলনের সময় এবং তার পরবর্তী কালেও বহুদিন পর্যন্ত প্রেমচন্দ দেশের প্রতিটি শিরা-উপশিরার খবর রেখেছেন এবং একের পর এক প্রেরণাদায়ক রচনার মাধ্যমে তিনি মানুষকে পথ দেখিয়েছেন, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে না, সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ এই এক দশকে প্রেমচন্দ—জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক জাগৃতি, উচ্চ আদর্শের প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে যে অসামান্য কাজ করেছেন, ততটা অন্যান্য লেখকেরা সম্মিলিতভাবেও করতে সক্ষম হননি।

আরো ছ'-বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা বোধকরি ১৯২৬ সাল। ইতিমধ্যে আমি প্রেমচন্দজীর অনন্য রচনাসম্ভার অনেকটাই পড়ে ফেলেছি। আরো অনেক পড়ার সাধ ছিল, কিন্তু পূর্ণ হয়নি। প্রেমচন্দজীর কোনো লেখাই আমার কাছে একঘেয়ে মনে হয়নি। কবিতাই হোক বা গদ্য, ভারতীয় কিংবা বিদেশী খুব কম লেখকই আমাকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। এজন্য নিজেকে মাঝে মাঝে অবিশ্বাসী বলে মনে হয়, কিন্তু তারপরই ভাবি সামান্য কয়েকজন আছেন যাঁদের রচনা আংশিক হলেও, আমাকে প্রভাবিত করে। প্রেমচন্দজী তাদেরই একজন।

ঠিক বলতে পারব না যে, কখন থেকে প্রেমচন্দজী বেনারসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তবে বেনারসেই তাঁর দর্শন লাভের সুযোগ ঘটেছিল। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎটিকে দর্শন বলাই শ্রেয় কারণ সে সময় আমাদের মধ্যে কোনো বাক্যালাপের অবকাশ ঘটেনি। বড় মানুষকে সব সময় ফিটফাট থাকতে হবে, এমন কোনো স্থির বিশ্বাস আমার কোনো দিনই নেই, তাই প্রেমচন্দজীর সাদাসিধে কৃশ চেহারা, অর্ধ মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখমণ্ডল দেখে আমি নিরাশ হয়নি বরং উনি লেখনীর মাধ্যমে যে বৃহত্তর জনগণের সেবাব্রত পালন করছিলেন, ওঁর বেশভূষা আচার-আচরণ সব কিছুই সর্বতোভাবে তারই অনুরূপ ছিল।

আমার কাছে একবার একজন উর্দুর খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং কবি আক্ষেপ করেছিলেন যে, প্রেমচন্দ খাঁটি উর্দু জানেন না। ওনার উর্দু ভাষায় পুব দিকের বুলির প্রভাবই বেশি। আমি জানতাম যে এই লেখক মশাই লক্ষ্ণৌর

সেই নবাব বংশের ধারা বহন করছেন যাঁরা মনে করত গমও কোনো বড় গাছেই ফলে থাকে। এরা কেবল শহুরে মধ্যবিত্ত। শিক্ষিত সমাজ জীবনের সঙ্গেই পরিচিত এবং নিজ শ্রেণীর অন্যান্যদের মতোই কূপমণ্ডুক। এদের সুললিত উর্দু, আরবি শব্দে বোঝাই। এরা যদি নিজেরা গল্প উপন্যাস লেখে তাহলে—একটা প্রবাদ আছে যে খোদা টাক মাথা ব্যক্তির হাতে নখ দেন না।—নাহ'লে এরা হোরিথের (এক ধরনের পাখী—অনুঃ) মুখেও নিজেদের পছন্দসই শব্দ বসাতে পিছপা হতো না।

কিছু কিছু হিন্দী সাহিত্যিকের মত যে প্রেমচন্দের ভাষায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানা এবং গভীরতা নেই। ভাষার মুন্সীয়ানা সম্পর্কে দ্বিমত থাকতেই পারে। প্রেমচন্দের আগেও হিন্দীতে কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছিল, যেগুলিকে কোনো ভাবেই বিশ্বপর্যায়ে রাখা যায় না। প্রেমচন্দই এ বিষয়ে পথিকৃৎ। প্রেমচন্দ যখন লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর সামনে হিন্দী ভাষার মুন্সীয়ানা বা কুশলতার কোনো উদাহরণ ছিল না। সেজন্য সেই না থাকা ব্যাপারটার সমাধানও তাঁকেই করতে হয়েছিল। তাই তাঁর প্রথম প্রয়াস যদি আজকের চাহিদা মতো নিপুণ নাও হয়ে থাকে তার জন্যও তাঁকে দায়ি করা চলে না। আর ভাষায় গভীরতার অভাবের অভিযোগটি তো একেবারেই হাস্যকর অভিযোগ। প্রেমচন্দের লেখা অন্য ভাষায় অনূদিত হয়েও তার আপন মাধুর্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা লেখকের শ্রেষ্ঠত্বকেই সুনিশ্চিত করে। এখনো প্রেমচন্দের সমসাময়িক কিছু বিরুদ্ধ মতের লেখক আছেন যাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল। তাঁদের বিচার জয়যুক্ত হোক, তবে তা হয়তো টিকে থাকবে বড় জোর বিশ-পঁচিশ বছর। প্রেমচন্দের লেখা মূল হিন্দীতে পড়লে কোথাও কোথাও ভাষার প্রাচীনত্ব, কিছু জড়তা, ইত্যাদি অনুভূত হতে পারে। কিন্তু সেই লেখাই অনুবাদের মাধ্যমে আপন মাধুর্যে বিকশিত হয়।

শেষ বার যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন আমরা পরস্পরের খুবই পরিচিত। ইতিপূর্বে আমাদের একাধিক বার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। ১৯২১ সালে আমি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর (মার্কস) হিন্দীতে অনুবাদের কাজ করছিলাম, আচার্য নরেন্দ্রদেবের সহযোগিতায়। প্রেমচন্দজীর প্রেসেই সেটা ছাপার কাজ চলছিল। রাজনৈতিক ডামাডোলে সেটাকে অবশ্য শেষ করা যায়নি। সে সময় আমি একজন অভিজ্ঞ পর্যটকই শুধু নই—বছরে সাত-আট মাস তখন আমার তিব্বত কিংবা অন্য কোনো দেশ ভ্রমণে কাটে। শীতের সময় সারনাথে গিয়েছি। বার্ষিক উৎসবের সময় ছিল, আমার সে সময় ওখানে থাকার কথা।

একদিন প্রেমচন্দজী এলেন। ওঁর গ্রাম সারনাথ থেকে মাইল দেড়-দুই দূরে। (এরপর অনেকবার উনি যে গ্রামে জন্মেছিলেন, সেখানেও ঘুরে এসেছি, সেখানে

এক ভাঙা মূর্তির মাথা আমি পেয়েছিলাম। সেটা অবশ্য কোনো দেবতার মূর্তি ছিল না, ছিল প্রাক-ইসলামিক যুগের কোনো পুরুষের মূর্তি তাও আবার কায়স্থ পুরুষ। মূর্তির মাথার কেশ বিন্যাস এবং গ্রামটি কায়স্থ প্রধান হওয়া থেকেই এই সিদ্ধান্ত করা যায়। এমনও হতে পারে ভগ্ন মূর্তিটি প্রেমচন্দজীর কোনো পূর্বপুরুষের। মূর্তিটি আমি প্রয়াগ মিউজিয়ামে দিয়ে দিয়েছি।) সেখানে আমরা মাতুরে বসে অনেক আলোচনা করেছি, তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি যে সেটাই আমাদের শেষ দেখা।

শীতের শেষে তিব্বত চলে যাই। আর সেখানেই প্রেমচন্দজীর মৃত্যুসংবাদ পাই। প্রেমচন্দজীর রচনার সমস্ত নায়ক চরিত্র তাঁরই রূপ ধরে আমার সামনে যেন মূর্ত হয়ে দাঁড়াল।

প্রেমচন্দজী ভারতের অমর লেখক, অমর কথাশিল্পী। উনি সাহিত্যিক মনোরঞ্জন এবং উচ্চ আদর্শের প্রচারের সফল প্রয়াসই শুধু করেননি, বস্তুত তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর সাড়ে তিন দশকের লোকজীবনের স্বরূপ, লোক ইতিহাস, নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। আর কিছু কাল পর যা জানবার জন্য আমাদের কাছে আর কোনো সাধন থাকবে না। প্রেমচন্দজী তাঁর রচনার মাধ্যমে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের আবশ্যিক দিকগুলিকে আগামী যুগের জন্য সংরক্ষিত করেছেন। শতাব্দী কেটে যাবে, প্রেমচন্দের দেখা ভালো-মন্দ, হাসি-কান্নায় ভরা পৃথিবীর কোনো চিহ্নই হয়তো আগামীযুগের পৃথিবীতে থাকবে না, কিন্তু তখনো তাঁর লেখা পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে এবং অনুপ্রেরণা যোগাবে।

এ-থেকেই বিশ্বসভায় প্রেমচন্দজীর স্থান সম্বন্ধে আপনারা একটা ধারণা করতে পারেন। রাশিয়াতে প্রতি বছর লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেমচন্দ দিবস পালন করা হয়। তাঁর রচিত গোদানকে একটি মহৎ কৃতি মনে করে সেটিকে রুশ ভাষায় অনূদিত করা হয়েছে। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক জগতের পক্ষ থেকে রাশিয়া তাকে স্বাগত জানিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সাহিত্যে প্রগতির পথে বাধা

হিন্দী সাহিত্যের জন্য কি বিশাল ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। এখনও হিমালয়ের প্রান্ত থেকে বান্তার (মধ্যপ্রদেশ) আর জয়শলমীর থেকে পূর্ণিয়া পর্যন্ত—বিশাল এলাকার মানুষ হিন্দীকেই সাহিত্যের ভাষা বলে জানে। কত লোক তো আরও একটু এগিয়ে এই ভাষা শিখে একে মাতৃভাষা বলেই মানে। এত বড়ো জায়গার ষোলো-সতেরো কোটি মানুষ যেখানে তৈরি, এই অবস্থাতে হিন্দী বই তো পাঁচ-দশ হাজারের সংস্করণ হাতে হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়া উচিত। বই বেশি বিক্রি হলে লেখকের মর্যাদা বাড়ে। দক্ষিণাই শ্রদ্ধা বাড়ায়—ফলে লেখক আরও ভালোভাবে তাঁর লেখনীকে মনোগ্রাহী করার প্রয়াসী হবেন। কিন্তু আমি দেখছি যে বাংলা বা মারাঠী ভাষার বই যত তাড়াতাড়ি বিক্রি হয় হিন্দীতে তা হয় না। এ-কথা ঠিক যে, বই বেশি প্রচারের জন্য যে কোনো ভাষার পাঠকগোষ্ঠী গড়ে তোলাটা জরুরি কাজ। যদি হিন্দীভাষী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যায় তো আজ থেকে দশ বছরের মধ্যে অন্তত বিশ গুণ বেশি লোক লেখাপড়া জানবে, তারা স্কুলের শিক্ষার পরেও বই পড়ার অভ্যাসটা রাখবে। যদি এইভাবে সাহিত্যিক রুচিসম্মত পাঠকগোষ্ঠী পঞ্চাশ গুণ বেড়ে যায়, তবুও এরকম আশা করা যায় না যে, অনেক লোক বই কিনে পড়াশুনা করবে, বই লেখকদের ভাগ্য খুলে যাবে। সারাদিনের জন্য নুন-তেল লকড়ি যোগাড়ের পরেও প্রতি মাসে পাঠকদের হাতে কিছু বাড়তি থাকা চাই। রুশ দেশে পাঁচ লাখ, দশ লাখ সংস্করণের বই ছ' মাসের মধ্যেই কি করে দুর্লভ হয়ে যায়? এর কারণ একটাই —ওখানে কেউ ভুখা নেই। সকলেরই ট্যাঁকে কিছু না কিছু পয়সা আছে। এমন কেউ নেই যার ট্যাঁক খালি। আমাদের দেশে চার বছরের শিক্ষা যদি আবশ্যিক করা যায়, আর মানুষের পেটের দায় মিটিয়ে ভরণ পোষণের খরচের ওপরেও দশ টাকা করে মাসে বাড়তি থাকে তাহলে এখানেও দু'হাজার সংস্করণের বই বার করে দশ বছর ফেলে রাখতে হবে না। এর জন্যে চাই পূর্ণ বেগে সাহিত্যিক প্রগতি, শিক্ষা এবং জীবন যাপনের স্তরকে এখন থেকে আরও উন্নত করে তোলা।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আরও একটি কঠিন কাজ সামনে আসবে। যদি চার বছরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যায়, সব ভারতীয় ছেলে মেয়েদের জন্য, তাহলে কেবল পাঠ্য পুস্তকে ছাপতে যত কাগজে লাগবে, ততোটা দেশে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কাগজে তো শুধু পাঠ্য পুস্তক ছাপা হয় না। সরকারি কাজে, বে-সরকারি নানা কারবারেও অনেক কাগজ লাগে। তারপরে খবরের কাগজের দাবির কথা আগে ভাবতে হবে। একটাও সাহিত্যের বই যদি না ছাপা হয় তো আমাদের

বার্ষিক উৎপন্ন কাগজের দু'গুণ বেশি লাগে কেবল স্কুলের বই, সরকারি-আধা-সরকারি কাজ আর খবরের কাগজের জন্যে। এর অর্থ এই যে, আমাদের কাগজ কলগুলিকে বর্তমান উৎপাদনের চার-পাঁচগুণ বেশি কাগজ তৈরি করতে হবে। আজকাল যেভাবে আমাদের রাষ্ট্রের অগ্রগতি হচ্ছে, তাতে তো এ-কথা বলতেই হবে—দেহলী দূরস্ত্।

আমাদের সাহিত্যিক প্রগতির পথে আর একটি বড় বাধা আছে। আমাদের সাহিত্য প্রচার এবং প্রকাশের কাজ যে-সব ব্যক্তি বা সংস্থার ওপর ন্যস্ত আছে, তাদের কোনো স্থায়িত্ব নেই। একটি পত্রিকা বেরোলে তার উঁচুমান বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। লেখকদের সহযোগিতাও মেলে। অনেক পয়সার মালিক হয়তো ঐ পত্রিকার প্রকাশক। তবু তিনি চান, লেখকেরা বিনা বেতনেই কাজ করবেন। ধীরে ধীরে পত্রিকার খ্যাতিও বাড়ে। রাতারাতি পাঠকেরা প্রভাবিত হয় না। কারণ এখনও তাদের বোঝবার ক্ষমতা অপরিণত। এইভাবে আমাদের কত সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকা অকালেই মারা গেলো। সিনেমার মতো তো পত্রিকার খবর পেয়ে পাঠক দৌড়ে আসবে না। আমি সেই পাঠকদের কথাই বলছি, যাদের কাছে পয়সা আছে। যদি পত্রিকার মালিক দুই-এক বছর ধৈর্য ধরার জন্য তৈরি থাকেন, তাহলে লোকসানের ভয় থাকে না। তারপর ভেবেচিন্তে আরও অগ্রগতির চেষ্টা করা যায়। এ সময় যদি মালিক বেশি লোভ করতে চান বা পত্রিকার দাম বাড়িয়ে দেন বা খেলো কাগজে ছাপতে থাকেন, অথবা সচিত্র পত্রিকাকে চিত্র-বিহীন করেন অথবা ভালো সম্পাদকের যোগ্যতায় পত্রিকাটির আয় বাড়িয়ে তার সঙ্গে গণ্ডগোল পাকান, তাহলে কি যে হাল হয়, আমি এক যোগ্য সম্পাদকের বেলায় দেখেছি। যদি কোনো লেখকদের পত্রিকা কখনো বা পুরস্কার পায়, তবুও সে পত্রিকা প্রকাশক বন্ধ করে দেয়। আপনারাই বলুন, এই ধরনের পত্রিকার প্রতি ভালো লেখকদের সহানুভূতি, সহযোগিতা কি করে থাকতে পারে। এই পত্রিকার ওপর সাহিত্যিকের কি বিশ্বাস থাকা সম্ভব? পাঠকেরাই বা এই সবের প্রভাব এড়াবেন কি করে? যদি পত্রিকার মালিক সম্পাদককে ভাড়া করা জন্তু মনে না করে, তাঁকে সম্মান ও উৎসাহ দিতেন, লেখা-কাগজ-চিত্র-ছাপা ইত্যাদি আরও যদি উন্নত হতো, তাহলে দশ বছরের মধ্যে পত্রিকাগোষ্ঠী একটা সংগঠনের চেহারা নিতে পারত, তার দ্বারা সাহিত্যের কল্যাণ হতো, গৌরব বাড়ত, যেমনটা অন্য দেশে হয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকাতে কত প্রেস আর কত পত্র-পত্রিকা বেরোয়, একশো দেড়শো বছর বেরোচ্ছে—এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। বিলেতের প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক 'টইমস্'-এর কথাই ধরুন। আপনি এর সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, তবু এত জানবার জিনিস ওতে থাকে যে, আজও তার মুখ্য স্থান রয়ে গেছে।

আমাদের দৈনিক পত্রের কিছু সুবিধা আছে। শিক্ষার অভাব, পয়সার

অভাব ছাড়াও সমাচার পত্র পড়ার লোকও কম, তার জন্যই সমস্যা। অনেক কিছু জানা যায় বলে লোকে খবরের কাগজ কেনে। কিন্তু হিন্দী পত্রিকা যে-রকম অবহেলায় সম্পাদিত হয়, তার জন্য ভালো প্রেস আর ভালো কর্মীর জন্য অন্তত দশ লাখ টাকা পুঁজি চাই। ওসব দিন চলে গেছে, যখন গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী নিজের হৃদয়বত্তা, কলম আর কয়েকজন সহানুভূতিশীল বন্ধুর সাহায্যেই পত্রিকা বার করেছিলেন। তার পরেই তাকে 'দৈনিক' রূপ দিয়েছিলেন।

একথা সবাই জানে যে, আমাদের সব ভালো ভালো পত্র-পত্রিকা এখন কোটি-পতিদের কব্জায় চলে গেছে। বড় বড় সংবাদপত্রের কথা না বলাই ভালো। যে-সব মালিকের প্রেস থেকে ইংরেজি এবং হিন্দী দু'রকম কাগজই বেরোয়, তিনি তাঁর হিন্দী বিভাগের কর্মীদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ পয়সাও খরচ করতে চান না। ইংরেজি টাইপের সমপরিমাণ টাইপও দেন না—এটুকু তাঁরা করতেই পারেন। এক দৈনিক কাগজের মালিককে যখন আমি এ-কথা বলি, তিনি বল-লেন, তাহলে তো লোকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পত্রিকা নিজের পায়ে দাঁড়াবে—মালিকের পক্ষে সেটা লাভজনক হবে ; সে ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য আমাদের ভূমিকা পালন করতে পারিনি। কেন না তাহলে দু-একটা হিন্দী দৈনিকও চলবে, যে-গুলিকে আমি উঁচু স্তরে উন্নীত করতে পারি। এটুকু বলা যায়, এরকম দু'-একটা হিন্দী দৈনিক পত্র-পত্রিকা নিশ্চয়ই আছে, যার মান আমরা অবশ্যই উঁচু বলতে পারি, তাঁরা তাঁদের পত্রিকার মানকে ধরে রেখেছেন। বাকি সব নতুন-পুরানো পত্রিকাগুলি, শুধুমাত্র খবরের সূচিপত্র। এজন্য এই ধরনের কাগজের সাফল্য অনেকটা সিনেমার সাফল্যের মতো। কাগজে লোকে সংবাদ জানতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোরঞ্জনও হয়। বাজারে যা কিছু খবর পাওয়া যায় তাই দিয়েই পাঠকদের সন্তোষ বিধান করতে হয়।

আমরা যখন পত্র-পত্রিকার স্থায়িত্বের আবশ্যকতার কথা ভাবছি, তখন সাহিত্য প্রকাশন সংস্থারও স্থায়িত্বের আবশ্যকতা-সফলতা বিষয়েও ভাবতে হবে। কত প্রকাশন সংস্থা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ হয়, কেউ কেউ পুঁজি না নিয়েই কাজ শুরু করে, তারপর ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। প্রথমে যে উদ্দেশ্য ছিল, তা নিয়ে অগ্রসর হলে সাহিত্যের কাজ করা হতো। একটা সময় পর্যন্ত সে-আদর্শ থাকে। কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সে খুশি হতে পারে না। তার নজর তখন জুয়াড়ির মতো হয়ে যায়, আর পরের দিন থেকে সে কোটিপতি না হোক, লাখপতি হতে চায়। সে দেখে, কি রকম বই ছাপলে দশ-বিশ হাজার কিংবা তারও বেশি বিক্রি হয়, তখন আর ছাপা জিনিসের গুণাগুণ দেখে না। আমার প্রকাশক অনেক সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করে—এইভাবে পিছল পথ ধরেছে। আজ এরকম ডজন ডজন প্রকাশক মিলবে, যারা চোখের সামনে দশ-বিশ লাখ টাকার মালিক হয়েছেন। সাহিত্য

বিক্রি করেই ওঁরা এত কামিয়েছেন। কিন্তু গোঁসাইজির উক্তি কি মিথ্যা হতে পারে?—'জিন প্রতি লাভ লোভ অধিকাই?' একবার যার পতন হয়েছে সে আর আদর্শের পথে উঠে আসতে পারে না। আমার প্রকাশকদের মধ্যে চার জনকে এই রকম হতে দেখলাম। তাহলে আর কি করে আশা করা যায় যে উচ্চ মানের সাহিত্য প্রকাশক তৈরি হয়ে উঠবে?

বড় প্রকাশকদের সম্বন্ধে যে কথা বললাম, সাহিত্যিক সংস্থাগুলি সম্পর্কেও সে-কথা সমান প্রযোজ্য। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, আমাদের দেশে এখনো ঐ-রকম সংস্থায় বিশ্বাসের শেকড় গভীরে পৌঁছতে পারেনি। এইজন্য কিছু সময়ের জন্য সংস্থাগুলি বেশ কাজ করে, তারপর নানা কারণে সেগুলি বৈশ্যতন্ত্রের শিকার হয়ে পড়ে। সেজন্য আমাদেরই দোষে বিশাল আকারে সাহিত্যের প্রাসাদ বা পরিষদ গড়ে উঠতে পারছে না।

সাহিত্যিকের দায়িত্ব

দিল্লীতে একজন ইংরেজ সাংবাদিক অত্যন্ত ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে* রুশ নেতাকে স্বাগত জানাতে দিল্লীতে যত পোস্টার আর তোরণ-লেখ বানানো হয়েছে, তাতে ইংরেজি সম্পূর্ণ বয়কট করা হয়েছে, কেবল হিন্দী আর রুশ ভাষা স্থান পেয়েছে। সংবাদপত্রে নিজের নিজের মনোভাব ইংরেজিতে ওঁরা ব্যক্ত করেন কিন্তু সাহেবদের ভাষা ইংরেজি যেন এখন অভিশপ্ত।

যদি আজ দিল্লীর ঘনী ঘোরী হিন্দীকে উপেক্ষা করে বা তার সঙ্গে বিরোধ করে, তবে সেটা কোনো নতুন কথা নয়। দ্বাদশ শতকের শেষে দিল্লী হয়ে উঠেছে বিদেশী ব্যবসায়ীদের রাজধানী, তখনও ইংরেজের কোনো অধিকার জন্মায়নি, ১৮ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত প্রায় দু'শো বছর—দিল্লীর ঘনী ঘোরীর সঙ্গে হিন্দীর কোনো সম্বন্ধ ছিল না। বাজারে কিছু শাক-শব্জী কিনতে গেলে নিচুতলার লোকেদের ভাঙা ভাঙা মুখের ভাষাই ছিল ঘনী ঘোড়ীর ভরসা, তখনও হিন্দী গৃহীত হয়নি, কেবল ফারাসিই ছিল প্রশাসনের ভাষা। ফারসিতে ফরমান জারি হতো। ফারসিতে চলত সরকারি কাজকর্ম। ঐ ভাষাতে লেখা বইয়ে পুরস্কার মিলত, তৃতীয় শ্রেণীর কবিও মহাকবি হয়ে উঠত। ছ'শতাব্দী ধরে দিল্লীতে ফারসি হুকুমত চাল ছিল। আমাদের দেশের দু'-এক জন ফারসি কবি ফারসি দুনিয়া তৈরির কথা ভাবছেন। নিজের মুখ মিষ্টি করে কোনো লাভ নেই। সাম্প্রতিক কালে এখানকার এক মহাকবি ফারসিতেও কবিতা লিখেছেন। আমাদের দেশের একটি প্রতিনিধি দল তেহরানে সেই উপলক্ষে একটি সাহিত্য-সভা আয়োজনের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের উপেক্ষা করার কারণ ওখানকার এক বিদ্বান ব্যক্তিকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বললেন, ওরকম ফারসি কবিতা লেখার লোক আমাদের একটা শহরেই অজস্র মিলবে। আমি ধরে নিতে পারি, ওঁর কথায় কিছু অসত্য থাকতেই পারে, কিন্তু ফারসি কবিতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যথার্থ। কারণ সেখানে ফারসি হলো নিজের ভাষা, আমার—আপনার পক্ষে তা নয়। আমাদের এই মহাকবির গর্ব, তিনি পরের ভাষায় কবিতা লিখেছেন। গালিবকে মেনে নেওয়া যায়, মিঞা ফারসি ছেড়ে নিজের মতো ভাষা বানিয়েছেন। অবশ্য গালিবের রচনা খাঁটি ফারসিতেও আছে, কিন্তু গালিবের হিন্দী—বলতে পারেন ফারসি লিপিতে লেখা হিন্দী—তাঁর কবিতা অমর।

---

* ১৯৫৫ সালে দিল্লী প্রান্তীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য-সভায় সভাপতির ভাষণ।

এখন আমি উর্দু শব্দ নিয়ে কিছু বলব। উর্দু আমাদেরই ভাষা, হিন্দীরই এক শৈলী, যাতে আরবি, ফারসি শব্দ বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত। অন্য ভাষার লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এলে শব্দের এরকম লেনদেন সব সময়ই সব দেশে ঘটে থাকে। শুদ্ধ দৈববাণী সংস্কৃতও এর ব্যতিক্রম নয়। যেমন 'কেন্দ্র' গ্রীক ভাষার শব্দ। আজ এ-কথা বললেই লোকে আশ্চর্য হবে। যাঁরা ফারিসতে কথা বলেন বা আরবিতে ধর্মগ্রন্থ পড়েন, এ-দেশে আছেন কয়েক শতাব্দী ধরে—শেষে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে গেছেন, তাই আমাদের ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের আগমে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এটাও ঠিক, কোনো ভাষায় অন্য ভাষার থেকে শব্দ ধার করারও একটা সীমা আছে। এটা সম্ভব নয় যে দশভাগ শব্দ থাকল মূল ভাষার, আর ধার-করা শব্দ নব্বই ভাগ। আমার ধারণা উর্দু-ওয়ালাদের দোষেই উর্দু বাইরের ভাষা রয়ে গেছে। যাঁরা ভবিষ্যতে আমাদের লেখক হবেন, তাঁদের এ-সব কথা ভাবতে হবে।

যে অমর সাহিত্যিক উর্দুতে লিখেছেন, তাঁর কৃতিত্ব আমি কম-বেশি করতে পারি না, তাঁকে ছাড়তেও পারি না। শিষ্টাচারবশে বা কাউকে খুশি করার জন্য বলছি না—অন্তর থেকেই উর্দুর মহান্ সম্ভাবনার কথা স্বীকার করি। এখন পরামর্শ দেবারও কোনো দরকার নেই। গালিব, নজীর, আকবর প্রমুখ কবিদের রচনা নাগরী অক্ষরেই ছাপা হয়েছে। সেগুলি লোকের হাতে হাতে ঘুরে আপন হয়ে গেছে।

এইভাবে দিল্লীর শ্রী গোয়লীয়জী শের-ও-শায়রী, শের-ও-শখুন জৈসে, নামে দুটি উর্দু কাব্যসংগ্রহ কবিদের বিশদ পরিচয় সহ প্রকাশ করেছেন এবং পাঠকরা সে-দুটি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আমি চাই যে উর্দুর মহৎ কোনো কোনো রচনা নাগরী অক্ষরে ছাপা হোক। এটা কোনো প্রশ্নই নয় যে, উর্দু দুরূহ বলে হিন্দীভাষী জনসাধারণ তাকে আপন করে নিতে পারবে না। আখেরে নিজের প্রদেশ এবং বিশেষজ্ঞ লোকে ছাড়া দিঙ্গল, ব্রজভাষা আর মৈথিলীর কবিতা প্রসঙ্গে ঐ একই কথা। ঐসব ভাষার সঙ্গে হিন্দীভাষী জনসাধারণের যে সম্পর্ক, উর্দু প্রসঙ্গেও সে-রকম—এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

সাহিত্যে সংকীর্ণ ধর্মীয় রাজনীতিক সাম্প্রদায়িকতা আসতে দেওয়া উচিত নয়। এরকম সংকীর্ণতার প্রভাব বেশিদিন থাকেও না।

দিল্লীর ছ'শো বছরের ইতিহাসে ভাষা এইরকম চেহারা নিয়েছিল। কিন্তু পুরো সফলতা আসেনি। রাজা এবং রাজংবশ চিরস্থায়ী নয়; অমর হলো জনতা। যেদিকে জনতার পাল্লা ভারী, সেদিকেরই বাড়-বাড়ন্ত।

দিল্লীর দরবারে যদিও হিন্দীর অধিকার ছিল না, কিন্তু ওখানকার এক মহান্ দরবারী আবদুর রহিম খান খানা ছিলেন। হিন্দীতে ওঁর নামের গৌরবোজ্জ্বল

আসনে আর কাউকে বাসানো যায় কি? রহিমের দোঁহা কেবল পণ্ডিত আর বিদ্বানদের জন্য নয়, হিন্দীভাষী জনসাধারণের মুখের ভাষাই যেন প্রকাশ পেয়েছে। দিল্লীতে সম্মান দেখানোর মতো সাহিত্য-মহারথীরা ছিলেন না। সেজন্যে কোনো একজনকে আমাদের তুলে ধরা দরকার। কিন্তু এখানে দিল্লীর সূর্য রহিম নিজের উপেক্ষিত সমাধিতে অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন নেই, বরং জেগে আছেন। তিনি জেগে আছেন, কারণ তাঁর জাগরণের সময় এসে গেছে, ওঁর হিন্দী এখন সারা দেশেরই মহান্ ভাষা। রহিমের সমাধিকে আমাদের হিন্দী সাহিত্যের এক তীর্থস্থান ভাবা উচিত। ওঁর প্রয়াণ-দিন কবে ছিল খুঁজে বার করা উচিত। ইংরেজি মাস ও তারিখ অনুসারে ঐ দিন এবং বছরব্যাপী এক সাহিত্যিক মেলা করা উচিত। আরম্ভ আপনারা করুন, তাঁকে বিশাল রূপ দেবে আমাদের আগামী প্রজন্ম। রহিম লংকার বিভীষণ ছিলেন না, তিনি জনগণের বাণীর মূর্ত রূপ হয়ে উঠেছিলেন।

রহিমের স্মরণ প্রসঙ্গে আর একটি পরিকল্পনা মনে আসছে। যদিও সেটা হিন্দীর ব্যাপার নয়, সংস্কৃতকে নিয়ে। তবে হিন্দী ও সংস্কৃতের মধ্যে বৈমাত্রেয় সম্বন্ধ নয়। এই সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ, মধুর এবং কার্যকর। অতীতকালে সংস্কৃতে আমরা যা কিছু পেয়েছি তার চেয়ে বেশি এখনো পাবার আছে। জগতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষার সারিতে আমাদের হিন্দীকে তুলে আনতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ঘাটতি—অর্থাৎ তার সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ অঙ্গ পরিভাষা—তাকে সম্পূর্ণ করতে সংস্কৃতের সাহায্য নিতে হবে। ঐ পরিভাষার দ্বারা আমাদের সব প্রাদেশিক ভাষাগুলি যথা অসমিয়া, বাংলা, উড়িয়া, তেলেগু তামিল, মালয়ালম, কন্নড়, মারাঠী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি একসূত্রে বাঁধা হবে, তারপরে এরকম আরও বন্ধন মিলবে। এই দেশের সব ভাষাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করতে সংস্কৃতই পারে অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে। আমি যে মহান্ ব্যক্তিটির কথা বলতে চাইছি তাঁর সঙ্গে দিল্লীরও সম্পর্ক ছিল। তিনি হলেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। তিনি ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। সংস্কৃত কবিতার ক্ষেত্রে আর বলা হয়তো ধৃষ্টতা কিন্তু কালিদাস আর বানভট্টের যুগকে বাদ দিলে তাঁর মতো কবি খুবই কম আছেন। যাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।

পণ্ডিতরাজের পিতা পদ্মভট্ট অন্ধ্র থেকে এসে কাশীতে বাস করতে থাকেন। জগন্নাথের জন্ম কাশীতেই। উনি সংস্কৃত শাস্ত্রের সব শাখাতে পারঙ্গম ছিলেন। কেবল কাব্য নয়, ব্যাকরণ ও দর্শনেও তাঁর বিচক্ষণতা ছিল।

এই দিল্লীতে খান খানান রহিমের কিছুকাল পরেই সাজাহানের পুত্র দারা-শিকোর জন্ম, ভারতীয় সাহিত্য এবং দর্শনে তাঁর ছিল অগাধ অনুরাগ। ওঁর সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে ইচ্ছা হলো; কিন্তু তখন উপযুক্ত অধ্যাপক কোথায়।

চারদিকে খোঁজ পড়ল, সকলেরই নজর কাশীর জগন্নাথের উপরে। আসাম পর্যন্ত কোনো কোনো সম্রাটের অমাত্য ঘুরে এলেন, শেষে পণ্ডিতরাজকে দিল্লীতে আহ্বান জানানো হলো। বেশ কয়েক বছর জগন্নাথ দিল্লীতে ছিলেন। দিল্লী বাসের মধুর স্মৃতি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলছেন :

দিল্লী বল্লভপাণিপল্লওতলে নীতং নবীনং বয়ঃ। (দিল্লী বল্লভের হস্তে নিত্য নূতন পল্লবিত হয়।)

আমি পণ্ডিতরাজের সর্বতোমুখী ঐশ্বর্যের কথা বলেছি। এটুকু বললেই সব বলা হয় না। উনি সমকালের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলেন যেমন দারা-শিকো আর তার প্র-পিতামহ আকবর। বাদশা আর জগন্নাথ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি শ্লোকও চালু আছে, এর সত্যতা লোক-প্রসিদ্ধিতে। বাদশা সাজাহান নাকি একদিন জগন্নাথের ওপরে প্রসন্ন হয়ে বলে-ছিলেন, পণ্ডিতরাজ একটা কিছু চাও, প্রার্থনা পূরণ করব। সেই সময় জগন্নাথের নজর ছিল দেওয়ানীখাসের কোনো এক সুন্দরীর দিকে। কিছুক্ষণ পরে নজর ফিরিয়ে তিনি পদ্যে তাঁর অভিলাষ প্রকাশ করলেন :

ন যাচে গজালি ন ওয়া বাজি রাজি ন বিত্যেষু চিত্তং মদিয়ং কদাপি।
ইয়ং সুস্তনী মত্তকন্য স্তহস্তা লবঙ্গী কুরঙ্গী দৃগঙ্গী করোতু॥

(আমি অশ্ব, গজ, ধনদৌলত কোনো কিছুই চাই না। চাই মৃগনয়নী যুবতী কন্যা লবঙ্গকে।)

পণ্ডিতরাজ হাতি ঘোড়া, টাকা, পয়সা প্রার্থনা করেননি। উনি চেয়েছিলেন মৃগনয়নী লবঙ্গকে।

ও-রকম ইচ্ছা একজন কামুকের মুখে বেমানান লাগতো না, এর মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট নেই। পরন্তু পণ্ডিতরাজ লঘুভাবে লবঙ্গী-প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তাঁকেই তিনি অর্ধাঙ্গিনী রূপে স্বীকার করেন। ঐ সময় কাশীতে এবং সারা দেশে হিন্দু ধর্ম কি তাঁকে বরদাস্ত করতে পারে। সকলের মুখেই এক কথা পণ্ডিতরাজ তো ধর্মভ্রষ্ট। নানাভাবে তাঁকে সকলে অপমান করেছে। কেউ তাঁর হাতে জল গ্রহণ করত না। সকলেই গলায় ধাক্কা দিয়ে হিন্দু সমাজ থেকে তাঁকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু তিনি শুধু নামেই পণ্ডিতরাজ ছিলেন না। নিজেদের সংস্কৃতি তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি জানতেন আজকের কূপমণ্ডুক কথা চারশো বছর পরে কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। সুতরাং তিনি ভয় পাননি। পণ্ডিতরাজ থাকবেন, জগন্নাথ থাকবেন। নিজের ধর্মে তাঁর আগের মতোই আস্থা ছিল। বুড়ো বয়সে মথুরায় তিনি জীবন ত্যাগ করেন। নিয়ম করে তিনি প্রতি বছর কাশীতে গুরুর কাছে যেতেন। ওঁর কাছেও বিদ্যার্থীরা আসত। কাশীর কোনো পণ্ডিত তাঁকে এই পুণ্য কার্য থেকে বিরত করতে

পারেননি। লবঙ্গী পণ্ডিতরাজের সঙ্গে ছিল। দু'জনের জীবন এবং দৈনন্দিন কর্মসূচি জানতে পারলে খুবই মনোরঞ্জক হতো। কিন্তু এতদিন পরে কি করে সে-সব জানা যাবে? তাঁর বিদ্যাবত্তা, নির্ভিকতা ও সাহসের কথা সকলেরই জানা।

'ন—যাচে গজালি'—এই শ্লোক আমি অনেক আগে এক ধার্মিক পণ্ডিতের মুখে শুনেছিলাম—তিনি বেশ গর্ব করেই বলেছিলেন পণ্ডিতরাজের নির্ভিকতা আর সাহসের নজির হিসেবে। লোকে একদিন বলেছিল, পণ্ডিত রাজ হিন্দু নয়, ধর্মভ্রষ্ট যবন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই জগন্নাথের নিষ্ঠাকে পুরো মাত্রায় মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়েছিল।

এর পরে আজ পর্যন্ত সেই পরম্পরাই চলে আসছে। যদিও এই সত্যে কিছু সংশয় আছে। কিন্তু এ এক উৎকৃষ্ট কবিতার মতোই মধুর। পণ্ডিতরাজ এবং তাঁর স্ত্রী লবঙ্গী দু'জনেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ছাত্রদের মারফতে এদের খবর কাশীতে আগেই পৌঁছিয়ে গিয়েছিল। লবঙ্গীর সঙ্গে পণ্ডিতরাজ মণিকর্ণিকার ঘাটে, সবচেয়ে ওপরের সিঁড়িতে বসে নিজের লেখা মধুর গঙ্গা লহরী থেকে গঙ্গার বন্দনা শুরু করেছেন। যদি তুমি আমার কথা সত্যি বুঝে থাক তবে এসে সাক্ষী দাও। লোকে বলে, তিনি গঙ্গা লহরীর এক এক পদ আবৃত্তি করেছেন আর গঙ্গা এক এক সিঁড়ি ওপরে উঠে এসেছে। যখন গঙ্গা লহরীর শেষপদ আবৃত্তি করা শেষ হলো, তখন জগন্নাথ আর লবঙ্গীর পায়ের কাছে পৌঁছে গঙ্গা বললেন, 'পণ্ডিত পুত্র, তুই আর লবঙ্গী আমার সঙ্গে চল'। এইভাবে পণ্ডিতরাজ গঙ্গা পরীক্ষায় নিজের শুদ্ধতা প্রমাণ করেছেন।

খান সাহেব আর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সমকালের দিল্লী সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করেছেন। আজ দিল্লীর ধনী-ঘরানার মানুষও ইচ্ছা করেই হিন্দীর বন্ধন মানতে প্রস্তুত। তবু এখনও মতভেদের অবসান ঘটেনি। আমার ধারণা ঐ বিরোধ কালের প্রচণ্ড প্রবাহে একটা নিদৃষ্ট রূপ নেবে। তা নিয়ে এখনই ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। দিল্লীতেই তো হিন্দীর পুষ্টির সব কিছু উপকরণ নেই।

দিল্লী এমন এক মহানগরী যেটি হিন্দুরই জন্মস্থান। যমুনার দুই তীরে প্রচলিত কুরু—কুরু-জাঙ্গল দেশের ভাষা—কৌরবী, সেখান থেকেই পল্লবিত হয়ে হিন্দীর উদ্ভব, যমুনার পূর্বদিকে মীরাট আর পশ্চিমে হরিয়ানা—দুই ভাষার মধ্যে ঐক্য নেই। একটিতে যেখানে 'সৈ' এবং অন্যটিতে 'হৈ' ঠিক গুজরাতী ভাষাতেও তেমনি 'স' আর 'হ'—এর ভেদ দেখা যায়। কাঠিয়াবাড়ির 'হারী' গুজরাতীতে 'সারী' দুইয়ের অর্থ এক—আচ্ছা, কিন্তু 'স' আর 'হ'—এর ভেদ থেকে গুজরাতের ঐক্য বন্ধনে কোনো বাধা হয়নি।

একই কথা মীরাট আর হরিয়ানার ভাষা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। হিন্দীতে যাঁরা

সাহিত্যসেবক আছেন, তাঁদের অনেকেরই মাতৃভাষা হিন্দী নয়; কারো কারো ভোজপুরী কারো বা অবধী, ব্রজ বা অন্যভাষা। আমরা নিজেদের কাজকর্মের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহার করি, কেউ কেউ তাতে সাহিত্য রচনাও করেন। তবু হিন্দীর পেছনেই বিপুল জনসমর্থন। ঐ প্রাচীন কুরু—কুরু-জাঙ্গল অঞ্চলের যোদ্ধারা কি ভাষায় কথা বলতেন, তখন তো কথাবার্তার আর সাহিত্যের ভাষা হিন্দীই চালু ছিল। এত বিপুল সংখ্যক নর-নারীর মাতৃভাষা হিন্দী বলে দিল্লীর দ্বিধাগ্রস্ত কিছু ত্রিশঙ্কু ব্যক্তি যদি হিন্দীর অনিষ্ট করতে চায় তো কতটুকু করতে পারবে।

হিন্দীর স্থানীয় ভাষা কৌরবীর দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, এই ভূমির সাহিত্য স্রষ্টাদের কর্তব্য হলো কৌরবী মনে রাখা। যদি কোনো সাহিত্যিক ভাষা জীবন্ত ভাষা না হয়ে থাকে তাহলে স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ ডায়ালেক্টের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নেই। বিদ্যানের বিচার এই যে, স্থানীয় ভাষা থেকে যে সাহিত্যিক ভাষা সম্বন্ধ ছিন্ন করল, সে আসলে নদীর মূল প্রবাহ বিচ্ছিন্ন খাড়ির মতোন। যদি খাড়ির জল গভীর নাও হয় তো নদীর নিরন্তন প্রবাহিত ধারার তেজ এবং জীবনদায়িনী শক্তি থাকতে পারে না। আমাদের প্রেমচন্দের মাতৃভাষা ছিল ভোজপুরী। তিনি শুধু শহরবাসী মধ্যবিত্তের জীবন কথাই চিত্রিত করতে চাননি। ওঁর অমর লেখনী জনসাধারণকে অনেক অগ্রসর করে দিয়েছে, আর ব্যাপক জন-জীবন চিত্রণের তাগিদে তিনি ভোজপুরী থেকে অনেক শব্দ নিয়েছেন। ভোজপুরী থেকে হিন্দীর দূরত্ব সত্ত্বেও সেই ভাষা থেকে হিন্দীর উপযোগী শব্দকে বেছে নেবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রেমচন্দের ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি খুব কম শব্দই গ্রহণ করতে পেরেছেন। কৌরবীর সঙ্গে হিন্দীর গভীর সম্পর্ক আছে। ফলে আরও বেশি সংখ্যায় শব্দ গ্রহণ করা যেত। শুধু তাই নয়, জীবনের যে দিককে হিন্দী লেখকরা শব্দের অভাবের জন্যে মাঝপথে ছেড়ে দেন, তা আমাদের কৌরবী অঞ্চলের সাহিত্যিকরা পরি-পূর্ণভাবে চিত্রিত করতে পারেন। আমি মনে করি এ বিষয়ে সংকোচ করা খুব ভুল।

'ময়লা আঁচল' উপন্যাসে হিন্দী বলয়ের সীমান্ত জেলা পূর্ণিয়ার আঞ্চলিক শব্দ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। তার ফলে ভাষা কত সুন্দর হয়েছে, সহৃদয় পাঠক জানেন। এর থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

কৌরবী অঞ্চলের আর একটি মহত্ত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কৌরবী লোকসাহিত্যের দিকে এখনকার কিছু সাহিত্যিক দৃষ্টি দিয়েছেন, সেগুলি সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু কৌরবীতে হিন্দীর প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে আমি আপনাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করতে চাই। রাজস্থানী আর গুজরাতী ভাষাতে নয়, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কন্নড় ভাষার প্রাচীনতম

সাহিত্য জৈনদের দ্বারা সৃষ্ট এবং সুরক্ষিত হয়েছে। জৈনধর্ম, এমন কি বৌদ্ধধর্ম লোক-ভাষাকে সমাদর করেছে। লোক-ভাষাতেই জৈন বৌদ্ধ লেখকেরা সাহিত্য সৃষ্টি এবং তার সুরক্ষা করেছেন। তার পরিণামেই প্রাকৃত—অপভ্রংশের পর উপরিউক্ত আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্য-নিদর্শন রয়ে গেছে। কৌরবী প্রদেশের অনেক গ্রামে ও শহরে অনেক বড় বড় মানুষ জৈন পরিবারে জন্মেছেন। সেখানে ওঁদের মন্দির, উপাসনার জায়গা আছে, ঐসব জায়গায় অবশ্যই কিছু ধর্মপুস্তক রয়ে গেছে। তার মধ্যে অনেক হাতে লেখা পুথিও থাকা স্বাভাবিক। এরকম মন্দির আর উপাসনালয়ের সংখ্যা কৌরবী এলাকায় হাজার খানেক আছে। অর্থাৎ ঐসব জায়গায় হাজার খানেক ছোটোখাটো গ্রন্থাগার থাকা সম্ভব। যেখানে হিন্দীর প্রাচীন সাহিত্য-নিদর্শন পাবারও সম্ভাবনা আছে। 'জ্ঞানপঞ্চমী কথা' সাধারণ শ্রদ্ধালু নর-নারীর জন্য সর্বদাই জৈন বিদ্বানেরা লিখে থাকেন। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ পর্যন্ত কিছু না কিছু কৌরবী ভাষায় নিশ্চয় লেখা হয়েছে। তার মধ্যে পদ্য ও গদ্য দুই থাকতে পারে। সেগুলি খুঁজে বের করা খুবই জরুরি। একজনই হোক আর অনেকেই হোক, এই কাজে তরুণ সাহিত্য রসিকদের সেতুবন্ধ রচনা করতে হবে।

হিন্দীতে অনেক 'গতি রোধ' পর্যায়ের শব্দ ব্যবহার করা হয়। আমার ধারণা এটা ঠিক নয়। যদি আমাদের প্রগতি আকাঙ্ক্ষিত হয় তো প্রতি দশকেই একজন প্রেমচন্দ একজন জয়শঙ্কর প্রসাদ আবির্ভূত হতে পারেন, কিন্তু এরকম কখনও হয় না, হবে না। এ-সব ধারণা দূর করে আমরা যদি দেখি তো কি কথা সাহিত্য কি কবিতা, কি জ্ঞান-বিজ্ঞান সব ক্ষেত্রেই প্রগতি নজরে পড়ে। হিন্দীর ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো—সাহিত্য প্রকাশনের কোনো একটা বেশ বড় কেন্দ্র কোথাও গড়েনি।

বাংলা সাহিত্যের প্রকাশন কেন্দ্র হচ্ছে কলকাতা। আর পাকিস্তান হবার আগেও ঢাকা ছিল একটি কেন্দ্র। ওড়িয়া ভাষার কেন্দ্র কটক, তামিলের মাদ্রাজ, মারাঠীর বোম্বাই—কিছু কিছু পুনাতেও আছে। এইভাবে আমাদের অন্য সাহিত্যিক ভাষারও কেন্দ্র হচ্ছে একটি শহর, সেজন্য যত বই ঐসব জায়গায় প্রকাশিত হয়, তার খোঁজ-খবর সহজেই মেলে। হিন্দীর প্রকাশন যদি বিকেন্দ্রিত হয় তাতেও দোষের কিছু নেই। যাঁরা হিন্দী বিশেষজ্ঞ তাঁরাও বলতে পারেন না কোথা থেকে কি বিষয়ে কিরকম বই বেরোচ্ছে। কলকাতা থেকেও হিন্দী বই প্রকাশিত হয়, পাটনা, গোয়ালিয়র, জয়পুর, বোম্বাই ইত্যাদি নগর থেকে হিন্দী বই প্রকাশনের কাজ চলে। এজন্য আমাদের 'প্রকাশন সমাচার' ও 'হিন্দী প্রচারক' পত্রিকা দুটির কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এরা অনেকটা অভাব দূর করেছে।

তবু এ-কথা বলতেই হবে যে, হিন্দী প্রকাশনের একটি বড় কেন্দ্রের খুবই

অভাব। এই অভাব পূরনে দিল্লী তৈরি। এটা দেখে আমার ভালো লাগছে। গত চার-পাঁচ বছর ধরে হিন্দী বই প্রকাশের ক্ষেত্রে দিল্লী অনেক এগিয়ে গেছে। ওখানকার বই ব্যবসায়ীদের সাহস দেখে আমি খুশি। কারো প্রতি কটাক্ষ না করেই বলতে পারি আগামী বারো বছরের মধ্যে দিল্লী হিন্দী বই প্রকাশের সবচেয়ে বড় জায়গা হবে। হিন্দী বই প্রকাশের ক্ষেত্রে এখন যে-সব অসুবিধা দেখা যাচ্ছে, সেগুলি দূর হবে। কেবল সংখ্যায় নয়। গুণের দিক থেকেও এখন অনেক ভালো বই প্রকাশিত হচ্ছে। যতদিন সবটা না দেখা যাচ্ছে, ততোদিন এ-কথা বলা উচিত নয় যে, হিন্দীতে ভালো কিছুই বেরুচ্ছে না, সাহিত্যে গতি-রোধ হয়ে গেছে। নিজের সাহিত্যে প্রগতি হচ্ছে না বলে অসন্তোষ হতে পারে, কিন্তু সন্তোষজনক অপ্রগতির জন্য প্রযত্ন করবে কে? আমাদের সাহিত্যিকরা নিজেদের দোষ ত্রুটি বুঝতে পারে। কতকগুলি বিষয়ে—আমাদের লেখকেরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না। যার প্রতিভা ও ক্ষমতা আছে, সেও অলস। অনেক লোক তো অনধিকার চর্চার ধাঁধা সৃষ্টি করে। ব্যবসায়ী লোকেরা যদি অচল সিকি চালাবার চেষ্টা করে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যারা সমজদার মানুষ তারাও এতে প্রভাবিত হয়। এতে সাহিত্যের অনিষ্ট হচ্ছে। সাহিত্য প্রগতির পথে বাধা হচ্ছে। সে বাধা দূর করতে হবে।

প্রকাশকরা যতদিন পাঠ্য পুস্তক ব্যাপারে প্রলুব্ধ থাকবেন ততোদিন সৎ-সাহিত্যের প্রকাশনা ব্যাহত হবেই। পাঠ্যপুস্তকের প্রকাশন বস্তুত সরকারের হাতে যাওয়া উচিত, এর কিছু দোষও থাকতে পারে। আমার ধারণা, সরকারি ব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন চালু হলে ভালোই হবে। তখন প্রকাশকরা ভালো-ভাবে সাহিত্য সেবা করতে পারবেন। জনসাহিত্যের পুস্তক বেশি কাটে না, তাই প্রকাশকরাও বেশি টাকা লগ্নী করতে উৎসাহ পান না। হিন্দী লেখক আর জনসাহিত্য প্রকাশকের সমস্যা একই। হিন্দী ভাষীদের সংখ্যা ১৫-১৬ কোটি কিন্তু হিন্দীতে কোনো বই দু'হাজারের সংস্করণ বিক্রি করা খুবই কঠিন। অথচ ১৫ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত সোভিয়েত ইউনিয়ন গণরাজ্যের অন্তর্গত তাজিকিস্তানে উপন্যাস, ছোট গল্প কবিতা সাত-আট হাজার বিক্রি হওয়াটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। এই হিসাবে তো কোনো ভালো হিন্দী বইয়ের সংস্করণ ১ লাখের কম হওয়া উচিত নয়। ভবিষ্যতে হয়তো তা হবে, কিন্তু আমি জানি না আমার পরবর্তী প্রজন্মেই তা বাস্তবায়িত হবে কিনা।

পুস্তকের রাজ সংস্করণ প্রকাশ করতে গেলে সর্বজনীন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লোকের আর্থিক অবস্থারও একটু উন্নতি চাই। অন্ন, বস্ত্র, মাথার ওপরে ছাদ আর ছেলে পিলের ভরণ-পোষণের জন্য খরচ তো অনিবার্য, এ-সবের পর যদি আপনার ট্যাঁকে দশ-বিশ টাকা প্রতি মাসে বাড়তি থাকে, তবে আপনি মানসিক বিনোদন, কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য টাকাটা কাজে লাগাতে পারেন। পত্র-

পত্রিকা আর বইয়ের যা দাম, যদি আপনার মাসিক রোজগারের তুলনায় সেটা সামান্য হয়, তবেই তো আপনি বইপত্তর বেশি বেশি কিনতে পারবেন। আমাদের দেশে এটাই হলো সমস্যা। শিক্ষার হার কম। যাঁরা শিক্ষিত, তাঁদের নিজের পরিবার প্রতিপালন করে, কিছুটা খরচ বাঁচিয়ে বই পড়ার ক্ষিদে পূরণ করতে হয়। গরিব দেশের পক্ষে এই সমস্যা দূর করা কঠিন। তবু এই বাধা দূর করতে হবে।

হিন্দীর জন্য দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় জায়গা আবশ্যক, যেখানে রঙ্গমঞ্চ থাকবে, ভালো বইয়ের দোকান থাকবে, রাজধানী বলে বাইরের অনেক বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ ঘটবে। আর সহায়তাও পাওয়া যাবে। দিল্লীতে সৌভাগক্রমে রহিমের সমাধিক্ষেত্র এক বিশাল সাহিত্য-তীর্থ হিসেবে আমরা পেয়েছি। আর সেই সাহিত্য-তীর্থকে এক বিশাল রূপ দান করতে হবে।

ফারসির মহান্ কবি ফেরদৌসী তাঁর সময়ে যে মহানগর তুসে জন্মেছিলেন, সেই শহর সহ কয়েক মাইল এখন উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ওখানকার প্রকৃতি বর্ষাতেও অনুদার, সেই জন্যে চারদিকে তাকালে কোথাও সবুজ নজরে পড়ে না। ইরান ফেরদৌসীকে সম্মান করতে শিখেছে, তাঁর সম্মানার্থে সেখানে উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সে-সময় এই মরুভূমির রাজত্বে ফেরদৌসীর সমাধি সজ্জিত করার চেষ্টা হয়েছিল। আমিও একবার সেখানে গিয়েছিলাম। মশহদ থেকে কয়েক মাইল দূরে সেখানে পৌঁছানোর পরে মুখ্‌তসরে মকবরা দেখার পর ক্ষিদে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে উঠলাম। কিন্তু সেখানে ক্ষিদে তেষ্টা মেটানোর কিছুই ছিল না। যদি মালি ওখানে খোরমুজ না লাগাতো, তাহলে আমাদের ক্ষিদে তেষ্টা নিয়েই ফিরতে হতো। রহিমের সমাধি তুসের মতো মরুভূমিতে নয়, তা বৃহত্তর দিল্লীর মধ্যে অবস্থিত। তাঁর সমাধিক্ষেত্রকে আমাদের এক তীর্থের মতো রূপ দিতে হবে। ফুল, বাগিচ্য, গ্রন্থাগার, পারস্পরিক মিলন আর সাহিত্য আলোচনার জন্যে বাড়ি—আর আকাশের নিচে থাকবে এক বিস্তীর্ণ জায়গা। দিল্লীতে এ দুটি সংস্থার প্রয়োজন।

★